বৃহন্নলা
হুমায়ূন আহমেদ

বৃহন্নলা

১

অতিপ্রাকৃত গল্পে গল্পের চেয়ে ভূমিকা বড় হয়ে থাকে।

গাছ যত-না বড়, তার ডালপালা তার চেয়েও বড়। এই গল্পেও তাই হবে। একটা দীর্ঘ ভূমিকা দিয়ে শুরু করব। পাঠকদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন ভূমিকাটা পড়েন। এর প্রয়োজন আছে।

আমার মামাতো ভাইয়ের বিয়ে।

বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে, দেখতে রাজপুত্র না হলেও বেশ সুপুরুষ। এম· এ· পাস করেছে। বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করা এবং গ্রুপ থিয়েটার করা—এই দুইয়ে তার কর্মকাণ্ড সীমিত।

বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে হলে যা হয়—বিয়ের জন্যে অসংখ্য মেয়ে দেখা হতে লাগল। কাউকেই পছন্দ হয় না। কেউ বেশি লম্বা, কেউ বেশি বেঁটে, কেউ বেশি ফর্সা, কেউ বেশি কথা বলে, আবার কেউ-কেউ দেখা গেল কম কথা বলে। নানান ফ্যাঁকড়া।

শেষ পর্যন্ত যাকে পছন্দ হল, সে-মেয়ে ঢাকা ইডেন কলেজে বি·এ· পড়ে—ইতিহাসে অনার্স। মেয়ের বাবা নেই। মা'র অন্য কোথায় বিয়ে হয়েছে। মেয়ে তার বড়চাচার বাড়িতে মানুষ। তিনিই তাকে খরচপত্র দিয়ে বিয়ে দিচ্ছেন।

আমার মামা এবং মামী দু' জনের কেউই এই বিয়ে সহজভাবে নিতে পারলেন না। যে-মেয়ের বাবা নেই, মা আবার বিয়ে করেছে—পাত্রী হিসেবে সে তেমন কিছু না। তা ছাড়া সে খুব সুন্দরীও না। মোটামুটি ধরনের চেহারা। আমার মামাতো ভাই তবু কেন জানি একবারমাত্র এই মেয়েকে দেখেই বলে দিয়েছে—এই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। মেয়ের বাবা নেই তো কী হয়েছে? সবার বাবা চিরকাল থাকে নাকি? মেয়ের মা'র বিয়ে হয়েছে, তাতে অসুবিধাটা কী? অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন, তাঁর তো বিয়ে করাই উচিত। এমন তো না যে, দেশে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ।

মামা-মামীকে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হল, তবে খুব খুশিমনে মত দিলেন না, কারণ মেয়ের বড়চাচাকেও তাঁদের খুবই অপছন্দ হয়েছে। লোকটা নাকি অভদ্রের চূড়ান্ত। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। চামার টাইপ।

বিয়ের দিন তারিখ হল।

এক মঙ্গলবার কাকডাকা ভোরে আমরা একটা মাইক্রোবাস এবং সাদা রঙের টয়োটায় করে রওনা হলাম। গন্তব্য ঢাকা থেকে নব্বই মাইল দূরের এক মফস্বল শহর। মফস্বল শহরের নামটা আমি বলতে চাচ্ছি না। গল্পের জন্যে সেই নাম জানার প্রয়োজনও নেই।

তেত্রিশ জন বরযাত্রী। অধিকাংশই ছেলেছোকরা। হৈচৈয়ের চূড়ান্ত হচ্ছে। এই মাইক বাজছে, এই মাইক্রোবাসের ভেতর ব্রেক ডান্স হচ্ছে, এই পটকা ফুটছে। ফাঁকা রাস্তায় এসে মাইক্রোবাসের গিয়ারবক্সে কী যেন হল। একটু পরপর বাস থেমে যায়। সবাইকে নেমে ঠেলতে হয়। বরযাত্রীদের উৎসাহ তাতে যেন আরো বাড়ল। শুধু আমার মামা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়লেন। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'এটা হচ্ছে অলক্ষণ। খুবই অলক্ষণ। রওনা হবার সময় একটা খালি জগ দেখেছি, তখনি মনে হয়েছে একটা কিছু হবে। গিয়ারবক্স গেছে, এখন দেখবি চাকা পাংচার হবে। না হয়েই পারে না।'

হলও তাই। একটা কালভার্ট পার হবার সময় চাকার হাওয়া চলে গেল। মামা বললেন, 'কি, দেখলি? বিশ্বাস হল আমার কথা? এখন বসে-বসে আঙুল চোষ।'

স্পেয়ার চাকা লাগাতেও অনেক সময় লাগল। মামা ছাড়া অন্য কাউকে বিচলিত হতে দেখলাম না।

বরযাত্রীদের উৎসাহ মনে হল আরো বেড়েছে। চিৎকার হৈচৈ হচ্ছে। একজন গান গাওয়ার চেষ্টা করছে। শুধুমাত্র বিয়েবাড়িতে পৌঁছানোর পরই সবার উৎসাহে খানিকটা ভাটা পড়ল।

মফস্বল শহরের বড় বাড়িগুলি সাধারণত যে-রকম হয়, সে-রকম একটা পুরনো ধরনের বাড়ি। এইসব বাড়িগুলি এমনিতেই খানিকটা বিষণ্ন প্রকৃতির হয়। এই বাড়ি দেখে মনে হল বিরাট একটা শোকের বাড়ি। খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। লোকজন নেই। কলাগাছ দিয়ে একটা গেটের মতো করা হয়েছে, সেটাকে গেট না-বলে গেটের প্রহসন বলাই ভালো। একদিকে রঙিন কাগজের চেইন, অন্য দিকে খালি। হয় রঙিন কাগজ কম পড়েছে, কিংবা লোকজনের গেট প্রসঙ্গে উৎসাহ শেষ হয়ে গেছে। আমার মামা হতভম্ব। বরযাত্রীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। ব্যাপারটা কি?

হাফশার্ট-পরা এক চ্যাংড়া ছেলে এসে বলল, 'আপনারা বসেন। বিশ্রাম করেন।'

আমি বললাম, 'আর লোকজন কোথায়? মেয়ের বড়চাচা কোথায়?' সেই ছেলে শুকনো গলায় বলল, 'আছে, সবাই আছে। আপনারা বিশ্রাম করেন।'

আমি বললাম, 'কোনো সমস্যা হয়েছে?'

সেই ছেলে ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলল, 'জ্বি-না, সমস্যা কিসের?' এই বলেই সে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। আর বেরুল না!

বসার ঘরে চাদর পেতে বরযাত্রীদের বিশ্রামের ব্যবস্থা। বারান্দায় গোটা দশেক ফোল্ডিং চেয়ার। বিয়েবাড়ির সজ্জা বলতে এইটুকুই।

মামা বললেন, 'বলেছিলাম না অলক্ষণ? এখন বিশ্বাস হল? কী কাণ্ড হয়েছে কে জানে! আমার তো মনে হয় বাড়িতে মেয়েই নেই। কারোর সঙ্গে পালিয়েটালিয়ে গেছে। মুখে জুতোর বাড়ি পড়ল, স্রেফ জুতোর বাড়ি।'

মামা অল্পতেই উত্তেজিত হন। গত বছর তাঁর ছোটখাটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। উত্তেজনার ব্যাপারগুলি তাঁর জন্যে ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমি মামাকে সামলাতে চেষ্টা করলাম। হাসিমুখে বললাম, 'হাত-মুখ ধুয়ে একটু শুয়ে থাকুন তো মামা। আমি খোঁজ নিচ্ছি কী ব্যাপার।'

মামা তীব্র গলায় বললেন, 'হাত-মুখটা ধোব কী দিয়ে, শুনি? হাত-মুখ ধোবার পানি কেউ দিয়েছে? বুঝতে পারছিস না? এরা বেইজ্জতির চূড়ান্ত করার চেষ্টা করছে।

'কী যে বলেন মামা!'

'কথা যখন অক্ষরে-অক্ষরে ফলবে, তখন বুঝবি কী বলছি। কাপড়চোপড় খুলে ন্যাংটো করে সবাইকে ছেড়ে দেবে। পাড়ার লোক এনে ধোলাই দেবে। আমার কথা বিশ্বাস না-হয়, লিখে রাখ।'

মামার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই খালিগায়ে নীল লুঙ্গি-পরা এক লোক প্লাস্টিকের বালতিতে করে এক বালতি পানি এবং একটা মগ নিয়ে ঢুকল। পাথরের মতো মুখ করে বলল, 'হাত-মুখ ধোন। চা আইতাছে।'

মামা বললেন, 'খবরদার কেউ চা মুখে দেবে না, খবরদার! দেখি ব্যাপার কী।'

ভেতরবাড়ি থেকে কান্নার শব্দ আসছে। বিয়েবাড়িতে কান্না কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু এই কান্না অস্বাভাবিক লাগছে। মধ্যবয়স্ক এক লোক এক বিশাল কেটলিতে করে চা নিয়ে ঢুকল।! আমি তাঁকে বললাম, 'ব্যাপার কী বলেন তো ভাই?' সেই লোক বলল, 'কিছু না।'

ভেতরবাড়ির কান্না এই সময় তীব্র হল। কান্না এবং মেয়েলি গলায় বিলাপ। কান্না যেমন হঠাৎ তুঙ্গে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎই নেমে গেল। তার প্রায় সঙ্গে- সঙ্গেই মেয়ের বড়োচাচা ঢুকলেন। ভদ্রলোককে দেখেই মনে হল তাঁর ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। তিনি নিচু গলায় যা বললেন, তা শুনে আমরা স্তম্ভিত। কী সর্বনাশের কথা! জানলাম যে কিছুক্ষণ আগেই তাঁর বড়ছেলে মারা গেছে। অনেক দিন থেকেই অসুখে ভুগছিল। আজ সকাল থেকে খুব বাড়াবাড়ি হল। সব এলোমেলো হয়ে গেছে এই কারণেই। তিনি তার জন্যে লজ্জিত, দুঃখিত ও অনুতপ্ত। তবে যত অসুবিধাই হোক— বিয়ে হবে। আজ রাতে সম্ভব হবে না, পরদিন।

এই কথা বলতে-বলতে তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

আমার মামা খুবই আবেগপ্রবণ মানুষ। অল্পতে রাগতেও পারেন, আবার সেই রাগ হিমশীতল পানিতে রূপান্তরিত হতেও সময় লাগে না। তিনি মেয়ের বড়চাচাকে জড়িয়ে ধরে নিজেও কেঁদে ফেললেন। কাতর গলায় বললেন, 'আপনি আমাদের নিয়ে মোটেও চিন্তা করবেন না। আমাদের কিচ্ছু লাগবে না. আপনি বাড়ির ভেতরে যান বেয়াই সাহেব।'

অদ্ভুত একটা অবস্থা! এর চেয়ে যদি শুনতাম মেয়ে পালিয়ে গেছে, তাও ভালো ছিল। কারো ওপর রাগ ঢেলে ফেলা যেত।

আমরা বরযাত্রীরা খুবই বিব্রত বোধ করছি। স্থানীয় লোকজন এখন দেখতে পাচ্ছি।

তারা বোধহয় এতক্ষণ ভেতরের বাড়িতে ছিলেন। আমরা বসার ঘরেই আছি। খিদেয় একেক জন প্রায় মরতে বসেছি। খাবার কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না। এই পরিস্থিতিতে খাবারের কথা জিজ্ঞেসও করা যায় না। একজন মামাকে কানে-কানে এই ব্যাপারে বলতেই তিনি রাগী গলায় বললেন, 'তোমাদের কি মাথাটাথা খারাপ হয়েছে—এত বড় একটা শোকের ব্যাপার, আর তোমরা খাওয়ার চিন্তায় অস্থির! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এক রাত না খেলে হয় কী? খবরদার, আমার সামনে কেউ খাবারের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না।'

আমরা চুপ করে গেলাম। বার-তের বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে এসে পানভর্তি একটা পানদান রেখে গেল। কাঁদতে-কাঁদতে মেয়েটি চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। এখনও কাঁদছে।

মামা মেয়েটিকে বললেন, 'লক্ষ্মী সোনা, তোমাদের মোটেই ব্যস্ত হতে হবে না। আমাদের কিছুই লাগবে না।'

রাত আটটার দিকে থাকা এবং খাওয়ার সমস্যার একটা সমাধান হল। স্থানীয় লোকজন ঠিক করলেন, প্রত্যেকেই তাঁদের বাড়িতে একজন-দু'জন করে গেস্ট নিয়ে যাবেন। বিয়ে হবে পরদিন বিকেলে।

আমাকে যিনি নিয়ে চললেন, তাঁর নাম সুধাকান্ত ভৌমিক। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। বেঁটেখাটো মানুষ। শক্তসমর্থ চেহারা। এই বয়সেও দ্রুত হাঁটতে পারেন। ভদ্রলোক মৃদুভাষী। মাথার চুল ধবধবে সাদা। গেরুয়া রঙের একটা চাদর দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন বলেই কেমন যেন ঋষি-ঋষি লাগছে।

আমি বললাম, 'সুধাকান্তবাবু, আপনার বাসা কত দূর?'

উনি বললেন, 'কাছেই।'

গ্রাম এবং মফস্বলের লোকদের দূরত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তাদের 'কাছেই' আসলে দিল্লি হনুজ দূর অস্তের মতো। আমি হাঁটছি তো হাঁটছিই।

অগ্রহায়ণ মাস। গ্রামে এই সময়ে ভালো শীত থাকে। আমার গায়ে পাতলা একটা পাঞ্জাবি। শীত ভালোই লাগছে।

আমি আবার বললাম, 'ভাই, কত দূর?'

'কাছেই।'

আমরা একটা নদীর কাছাকাছি এসে পড়লাম। আঁতকে উঠে বললাম, 'নদী পার হতে হবে নাকি?'

'পানি নেই, জুতো খুলে হাতে নিয়ে নিন।'

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। এই লোকের সঙ্গে আসাই উচিত হয় নি। আমি জুতো খুলে পায়জামা গুটিয়ে নিলাম। হেঁটে নদী পার হওয়ার কোনো আনন্দ থাকলেও থাকতে পারে। আমি কোনো আনন্দ পেলাম না, শুধু ভয় হচ্ছে কোনো গভীর খানাখন্দে পড়ে যাই কি না। তবে নদীর পানি বেশ গরম।

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'আপনাকে কষ্ট দিলাম।'

ভদ্রতা করে হলেও আমার বলা উচিত, 'না, কষ্ট কিসের!' তা বললাম না। নদী পার হয়ে পায়জামা নামাচ্ছি, সুধাকান্তবাবু বললেন, 'আপনি ছেলের কে হন?'

'ফুপাতো ভাই।'

'বিয়েটা না-হলে ভালো হয়। সকালে সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন।'

'সে কী!'

'মেয়েটার কারণে ছেলেটা মরল। এখন চট করে বিয়ে হওয়া ঠিক না। কিছুদিন যাওয়া উচিত।'

'কী বলছেন এ-সব!'

'ছেলেটা সকালবেলা বিষ খেয়েছে। ধুতরা বীজ। এই অঞ্চলে ধুতরা খুব হয়।'

'আপনি বলছেন কী ভাই?'

'ছেলের বাবা রাজি হলেই পারত। ছেলেটা বাঁচত। গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ। তার ''না'' মানেই না।'

'ছেলে-মেয়ের এই প্রেমের ব্যাপারটা সবাই জানে নাকি?'

'জানবে না কেন? মফস্বল শহরে এইসব চাপা থাকে না। আপনাদের শহরে অন্য কথা। আকছার হচ্ছে।'

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ কী সমস্যা! বাকি পথ দু' জন নীরবে পার হলাম।

পুরোপুরি নীরব বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। ভদ্রলোক নিজের মনেই মাঝে-মাঝে বিড়বিড় করছিলেন। মন্ত্রটন্ত্র পড়ছেন বোধহয়।

ভদ্রলোকের বাড়ি একেবারে জঙ্গলের মধ্যে। একতলা পাকা দালান। প্রশস্ত উঠোন। উঠোনের মাঝখানে তুলসী মঞ্চ। বাড়ির লাগোয়া দু'টি প্রকাণ্ড কামিনী গাছ। একপাশে কুয়া আছে। হিন্দু বাড়িগুলো যেমন থাকে, ছবির মতো পরিচ্ছন্ন। উঠোনে দাঁড়াতেই মনে শান্তি-শান্তি একটা ভাব হল। আমি বললাম, 'এত চুপচাপ কেন? বাড়িতে লোকজন নেই?'

'না।'

'আপনি একা নাকি?'

'হুঁ।'

'বলেন কী! একা-একা এত বড় বাড়িতে থাকেন!'

'আগে অনেক লোকজন ছিল। কিছু মরে গেছে। কিছু চলে গেছে ইণ্ডিয়াতে। এখন আমি একাই আছি। আপনি স্নান করে ফেলুন।'

'স্নান-ফান লাগবে না। আপনি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন, তাহলেই হবে।

'একটু সময় লাগবে, রান্নার জোগাড় করতে হবে।'

'আপনি কি এখন রান্না করবেন?'

'রান্না না করলে খাবেন কী? বেশিক্ষণ লাগবে না।'

ভদ্রলোক গামছা, সাবান এবং একটা জলচৌকি এনে কুয়ার পাশে রাখলেন।

'স্নান করে ফেলুন। সারা দিন জার্নি করে এসেছেন, স্নান করলে ভালো লাগবে। কুয়ার জল খুব ভালো। দিন, আমি জল তুলে দিচ্ছি।'

'আপনাকে তুলতে হবে না। আপনি বরং রান্না শুরু করুন। খিদেয় চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে।'

'এই লুঙ্গিটা পরুন। ধোয়া আছে। আজ সকালেই সোডা দিয়ে ধুয়েছি। আমার

আবার পরিষ্কার থাকার বাতিক আছে, নোংরা সহ্য করতে পারি না।'

ভদ্রলোক যে নোংরা সহ্য করতে পারেন না, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তিনি রান্না করতে বসেছেন উঠোনে। উঠোনেই পরিষ্কার ঝকঝকে দুটো মাটির চুলা। সুধাকান্তবাবু চুলার সামনে জলচৌকিতে বসেছেন। থালা, বাটি, হাঁড়ি সবই দেখি দু' বার তিন বার করে ধুচ্ছেন।

'সুধাকান্তবাবু?'

'বলুন।'

'আপনি বিয়ে করেন নি?'

'না।'

'চিরকুমার?'

'ঐ আর কি।'

'আপনি করেন কী?'

'শিক্ষকতা করি। হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক। মনোহরদি হাই স্কুল।'

'রান্নাবান্না আপনি নিজেই করেন?'

'হ্যাঁ, নিজেই করি। এক বেলা রান্না করি। এক বেলা ভাত খাই, আর সকালে চিঁড়া, ফলমূল—এ-সব খাই।'

'কাজের লোক রাখেন না কেন?'

'দরকার পড়ে না।'

'খালি বাড়ি পড়ে থাকে, চুরি হয় না?'

'না। চোর নেবে কী? আমি এক জন দরিদ্র মানুষ। আপনি স্নান করে নিন। স্নান করলে ভালো লাগবে।'

অপরিচিত জায়গায় ঠাণ্ডার মধ্যে গায়ে পানি ঢালার আমার কোনোই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সুধাকান্তবাবু মনে হচ্ছে আমাকে না ভিজিয়ে ছাড়বেন না। লোকটি সম্ভবত শুচিবাইগ্রস্ত।

কুয়ার পানি নদীর পানির মতো গরম নয়, খুব ঠাণ্ডা। পানি গায়ে দিতেই গা জুড়িয়ে গেল। সারা দিনের ক্লান্তি, বিয়েবাড়ির উদ্বেগ, মৃত্যুসংক্রান্ত জটিলতা—সব ধুয়ে-মুছে গেল। চমৎকার লাগতে লাগল। তা ছাড়া পরিবেশটাও বেশ অদ্ভুত। পুরনো ধরনের একটা বাড়ি। ঝকঝকে উঠোনের শেষ প্রান্তে শ্যাওলা-ধরা প্রাচীন কুয়া। আকাশে পরিষ্কার চাঁদ। কামিনী ফুলের গাছ থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি গন্ধ। এক ঋষির মতো চেহারার চিরকুমার বৃদ্ধ রান্না বসিয়েছেন। যেন বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কোনো দৃশ্য।

'সুধাকান্তবাবু?'

'বলুন।'

'রান্নার কত দূর?'

'দেরি হবে না।'

'একা-একা থাকতে আপনার খারাপ লাগে না?'

'না, অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'বাসায় ফিরে আপনি করেন কী?'

'তেমন কিছু করি না। চুপচাপ বসে থাকি।'

'ভয় লাগে না?'

সুধাকান্তবাবু এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

খাবার আয়োজন সামান্য, তবে এত চমৎকার রান্না আমি দীর্ঘদিন খাই নি। একটা কিসের যেন ভাজি, তাতে পাঁচফোড়নের গন্ধ—খেতে একটু টক-টক। বেগুন দিয়ে ডিমের তরকারি, তাতে ডালের বড়ি দেওয়া। ডালের বড়ি এর আগে আমি খাই নি। এমন একটা সুখাদ্য দেশে প্রচলিত আছে তা-ই আমার জানা ছিল না। মুগের ডাল। ডালে ঘি দেওয়াতে অপূর্ব গন্ধ!

আমি বললাম, 'সুধাকান্তবাবু, এত চমৎকার খাবার আমি আমার জীবনে খাই নি। দীর্ঘদিন মনে থাকবে।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'আপনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই এত ভালো লেগেছে। **রুচির রহস্য ক্ষুধায়। যেখানে ক্ষুধা নেই, সেখানে রুচিও নেই।**'

আমি চমৎকৃত হলাম।

লোকটির চেহারাই শুধু দার্শনিকের মতো না, কথাবার্তাও দর্শনঘেঁষা।

সুধাকান্তবাবু উঠোনে পাটি পেতে দিলেন। খাওয়াদাওয়ার পর সিগারেট হাতে সেখানে বসলাম। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করা যেতে পারে। সুধাকান্তবাবুকে অবশ্যি খুব আলাপী লোক বলে মনে হচ্ছে না। এই যে দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে আছি, তিনি এর মধ্যে আমার নাম জানতে চান নি। আমি কী করি তাও জানতে চান নি। আমি এই মানুষটির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করছি, কিন্তু এই লোকটা আমার প্রতি কোনো আগ্রহ বোধ করছে না।। অথচ আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যারা মাস্টারি করে, তারা কথা বলতে খুব পছন্দ করে। অকারণেই কথা বলে।

প্রায় মিনিট পনের আমরা চুপচাপ বসে থাকার পর সুধাকান্তবাবু আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন একা-একা আমি এই বাড়িতে থাকতে ভয় পাই কি না, তাই না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তাই।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ভয় পাই। প্রায় রাতেই ঘুমুতে পারি না, জেগে থাকি। ঘরের ভেতর আগুন করে রাখি। হারিকেন জ্বালান থাকে। ওরা আগুন ভয় পায়। আগুন থাকলে কাছে আসে না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কারা?'

তিনি জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, 'আপনি কি ভূতপ্রেতের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

আমি মনে-মনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। পৃথিবী কোথায় চলে গিয়েছে—এই বৃদ্ধ তা বোধহয় জানে না। চাঁদের পিঠে মানুষের জুতোর ছাপ পড়েছে, ভাইকিং উপগ্রহ নেমেছে মঙ্গলের মরুভূমিতে, ভয়েজার ওয়ান এবং টু উড়ে গেছে বৃহস্পতির কিনারা ঘেঁষে, আর এই অঙ্কের শিক্ষক ভূতের ভয়ে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখছে। কারণ, অশরীরীরা আগুন ভয় পায়।

আমি বললাম, 'আপনি কি ওদের দেখেছেন কখনো?'

'না।'

'ওদের পায়ের শব্দ পান?'

'তাও না।'

'তাহলে?'

'বুঝতে পারি।'

'বুঝতে পারেন?'

'জ্বি। আপনি যখন আছেন, আপনিও বুঝবেন।'

'ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে পাব, তাই বলছেন?'

'হুঁ, তবে ওদের না, এক জন শুধু আসে।'

'তাও ভালো যে এক জন আসে। আমি ভেবেছিলাম দলবল নিয়ে বোধহয় চলে আসে। নাচ গান হৈ-হল্লা করে।'

'আপনি আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করছেন না?'

'ঠিকই ধরেছেন, বিশ্বাস করছি না। অবশ্যি এই মুহূর্তে আমার গা ছমছম করছে। কারণ, আপনার পরিবেশটা ভৌতিক।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ওরা কিন্তু আছে।'

আমি চুপ করে রইলাম। এই বৃদ্ধের সঙ্গে ভূত আছে কি নেই, তা নিয়ে তর্ক করার কোনো অর্থ হয় না। থাকলে থাকুক।

'আমার কাছে যে আসে, সে একটা মেয়ে।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি, এগার-বার বছর বয়স।'

'বুঝলেন কী করে তার বয়স এগার-বার? আপনাকে বলেছে?'

'জ্বি-না। অনুমান করে বলছি।'

'তার নাম কি? নাম জানেন?'

'জ্বি-না।'

'সে এসে কী করে?'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'মেয়েটি যে আসছে এই কি যথেষ্ট নয়? তার কি আর কিছু করার প্রয়োজন আছে?'

আমি চুপ করে গেলাম। আসলেই তো, অশরীরী এক বালিকার উপস্থিতিই তো যথেষ্ট। সুধাকান্তবাবু বললেন, 'আপনি নিজেও হয়তো দেখতে পারবেন।' আমি চমকে উঠলাম। ভদ্রলোক সহজ স্বরে বললেন, 'আমি ছাড়াও অনেকে দেখেছে।'

সুধাকান্তবাবু ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন এবং তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বিকট একটা হাসি শুনলাম। উঠোন কাঁপিয়ে গাছপালা কাঁপিয়ে হো-হো করে কে যেন হেসে উঠল। সুধাকান্তবাবু পাশে না থাকলে অজ্ঞানই হয়ে যেতাম। আমি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে, কে?'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ওটা কিছু না।'

আমি ভয়-জড়ানো গলায় বললাম, 'কিছু না মানে?'

'ওটা খাটাশ। মানুষের মতো শব্দ করে হাসে।'

'বলেন কী! খাটাশের নাম তো এই প্রথম শুনলাম। এ তো ভূতের বাবা বলে মনে

হচ্ছে! এখনো আমার গা কাঁপছে।'

'জল খান। জল খেলে ভয়টা কমবে।'

সুধাকান্তবাবু কাঁসার গ্লাসে করে পানি নিয়ে এলেন। খাটাশ নামক জন্তুটি আরেক বার রক্ত হিম-করা হাসি হাসল। সুধাকান্তবাবু যদি কিছু না বলতেন তাহলে ভূতের হাসি শুনেছি, এই ধারণা সারা জীবন আমার মনের মধ্যে থাকত।

লোকটার প্রতি এই প্রথম আমার খানিকটা আস্থা হল। আজগুবি গল্প বলে ভয় দেখান এই লোকের ইচ্ছা নয় বলেই মনে হল। এ-রকম ইচ্ছা থাকলে, এই ভয়ংকর হাসির কারণ সম্পর্কে সে চুপ করে থাকত।

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ঐ মেয়েটার কথা শুনবেন?'

'হ্যাঁ, শোনা যেতে পারে। তবে আমি নিজে অবিশ্বাসী ধরনের মানুষ, কাজেই গল্পের মাঝখানে যদি হেসে ফেলি কিছু মনে করবেন না।'

'এই গল্পটা কাউকে বলতে ভালো লাগে না। অবশ্যি অনেককে বলেছি। এখানকার সবাই জানে।'

'আপনার গল্প এখানকার সবাই বিশ্বাস করেছে?'

সুধাকান্তবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি যদি এখানকার কাউকে একটা মিথ্যা কথাও বলি, এরা বিশ্বাস করবে। এরা আমাকে সাধুবাবা বলে ডাকে। আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে কোনো মিথ্যা কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না। আমি থাকি একা-একা। আমার প্রয়োজনও সামান্য। মানুষ মিথ্যা কথা বলে প্রয়োজন এবং স্বার্থের কারণে। আমার সেই সমস্যা নেই। এইসব থাক, আমি বরং গল্পটা বলি।'

'বলুন।'

'ভেতরে গিয়ে বসবেন? এখানে মনে হচ্ছে একটু ঠাণ্ডা লাগছে। অগ্রহায়ণ মাসে হিম পড়ে।'

'আমার অসুবিধা হচ্ছে না, এখানেই বরং ভালো লাগছে। গ্রামে তেমন আসা হয় না। আপনি শুরু করুন।'

সুধাকান্তবাবু গল্প শুরু করতে গিয়েও শুরু করলেন না। হঠাৎ যেন একটু অন্য রকম হয়ে গেলেন। যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছু দেখতে চেষ্টা করছেন। খসখস শব্দ হল। নতুন কাপড় পরে হাঁটলে যেমন শব্দ হয়, সে-রকম। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কাঁচের চুড়ির টুং-টুং শব্দের মতো শব্দ। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

সুধাকান্তবাবু ফ্যাকাসে মুখে হাসলেন। আমি বললাম, 'কিসের শব্দ হল?'

তিনি নিচু গলায় বললেন, 'ও কিছু না, আপনি গল্প শুনুন। আজ ঘুমিয়ে কাজ নেই, আসুন গল্প করে রাত পার করে দিই।'

গা-ছমছমে পরিবেশ। বাড়ির লাগোয়া ঝাঁকড়া কামিনী গাছ থেকে কামিনী ফুলের নেশা-ধরান গন্ধ আসছে। কুয়ার আশেপাশে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে-নিভছে। উঠোনের চুলা থেকে ভেসে আসছে পোড়া কাঠের গন্ধ। আকাশ-ভরা নক্ষত্রবীথি।

সুধাকান্তবাবু গল্প শুরু করলেন।

২

'যুবক বয়স থেকেই আমাকে সবাই ডাকত সাধুবাবা। . . . .

'যদিও ঠিক সাধু বলতে যা বোঝায় আমি তা নই। তবে প্রকৃতিটা একটু ভিন্ন ছিল। সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে-দূরে রাখার স্বভাব আমার ছিল। শ্মশান, কবরস্থান এইসব আমাকে ছোটবেলা থেকেই আকর্ষণ করত। অল্প বয়স থেকেই শ্মশান এবং কবরস্থানের আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম। আমার বাবা শ্যামাকান্ত ভৌমিক তখন জীবিত। আমার মতিগতি দেখে অল্প বয়সেই আমার বিবাহ ঠিক করলেন। পাশের গ্রামের মেয়ে। ভবানী মিত্র মহাশয়ের প্রথমা কন্যা আরতি। খুবই রূপবতী মেয়ে। গ্রামাঞ্চলে এ-রকম মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। আমি বিবাহ করতে রাজি হলাম। কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে যাবার পর একটা দুর্ঘটনায় মেয়েটা মারা যায়।'

'কী দুর্ঘটনা?'

'সাপের কামড়। আমাদের এই অঞ্চলে সাপের উপদ্রব আছে। বিশেষ করে কেউটে সাপ।'

'তারপর কী হল বলুন।'

'মেয়েটির মৃত্যুতে খুব শোক পেলাম। প্রায় মাথাখারাপের মতো হয়ে গেল। কিছুই ভালো লাগে না। রাতবিরাতে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকি। সমাজ-সংসার কিছুতেই মন বসে না। গভীর বৈরাগ্য। কিছু দিন সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজ করলাম। ইচ্ছা ছিল উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পেলে মন্ত্র নেব। তেমন কাউকে পেলাম না।....

'আমার বাবা অন্যত্র আমার বিবাহের চেষ্টা করলেন। আমি রাজি হলাম না। বাবাকে বুঝিয়ে বললাম যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা না যে আমি সংসারের বন্ধনে আটকা পড়ি। পরিবারের অন্যরাও চেষ্টা করলেন—আমি সম্মত হলাম না। এ-সব আমার প্রথম যৌবনের কথা। না-বললে আপনি গল্পটা ঠিক বুঝতে পারবেন না। আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?'

আমি বললাম, 'না, বিরক্ত হব কেন?'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'প্রথম যৌবনের কথা সবাই খুব আগ্রহ করে বলে। আমি বলতে পারি না।'

'আপনি তো ভালোই বলছেন। থামবেন না—বলতে থাকুন।'

সুধাকান্তবাবু আবার শুরু করলেন—

'এরপর অনেক বছর কাটল। শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরতাম বলেই বোধহয় ঈশ্বর আমার ঘরটাকেই শ্মশান করে দিলেন। পুরোপুরি একা হয়ে গেলাম। মানুষ যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়। আমিও মানিয়ে নিলাম। আমার প্রকৃতির মধ্যে একধরনের একাকীত্ব ছিল, কাজেই আমার খুব অসুবিধা হল না। এখন আমি মূল ঘটনায় চলে আসব, তার আগে আপনি কি চা খাবেন?'

'জ্বি-না।'

'খান একটু চা, ভালো লাগবে।'

আমার মনে হল ভদ্রলোকের নিজেরই চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, বানান। একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে অবশ্যি।'

'ভিতরে গিয়ে বসবেন?'

'জ্বি-না, এখানেই ভালো লাগছে।'

চা শেষ করার পর দ্বিতীয় দফায় গল্প শুরু হল। এইখানে আমি একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম। আমার কাছে মনে হল ভদ্রলোকের গলার স্বর পাল্টে গেছে। আগে যে-স্বরে কথা বলছিলেন, এখন সেই স্বরে বলছেন না। একটা পরিবর্তন হয়েছে। আমার মনের ভুল হতে পারে। অনেক সময় পরিবেশের কারণে সবকিছু অন্য রকম মনে হয়।

সুধাকান্তবাবু বলতে শুরু করলেন—

'গত বৎসরের কথা। কার্তিক মাস। আমি বাড়িতে ফিরছি। রাত প্রায় দশটা কিংবা তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। আমার ঘড়ি নেই, সময়ের হিসাব ঠিক থাকে না।'

আমি সুধাকান্তবাবুকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার স্কুল তো নিশ্চয়ই চারটা-পাঁচটার দিকে ছুটি হয়। এত রাতে ফিরছিলেন কেন?'

সুধাকান্তবাবু নিচু গলায় বললেন, 'রোজই এই সময়ে বাড়ি ফিরি। সকাল-সকাল বাড়ি ফেরার কোনো উৎসাহ বোধ করি না। পাবলিক লাইব্রেরি আছে। ঐখানে পত্রিকাটত্রিকা পড়ি, গল্পের বই পড়ি।'

'বলুন তারপর কী হল।'

'তারিখটা হচ্ছে বারই কার্তিক, সোমবার। আমি মানুষ হিসাবে বেশ সাহসী। রাতবিরাতে একা-একা ঘোরাফেরা করি। ঐ রাতে রাস্তায় নেমেই আমার ভয়ভয় করতে লাগল। কী জন্যে ভয় করছে সেটাও বুঝলাম না। তখন মনে হল—রাস্তায় একটা পাগলা কুকুর বের হয়েছে, ভয়টা বোধহয় ঐ কুকুরের কারণে। আমি একটা লাঠি হাতে নিলাম। ····

'শুক্লপক্ষের রাত। ফক্‌ফকা জ্যোৎস্না, তবু পরিষ্কার সবকিছু দেখা যাচ্ছে না। কারণ কুয়াশা। কার্তিক মাসের শেষে এদিকে বেশ কুয়াশা হয়। ····

'নদীর কাছাকাছি আসতেই কুকুরটাকে দেখলাম। গাছের নিচে শুয়ে ছিল। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল এবং পিছনে-পিছনে আসতে লাগল। মাঝে-মাঝে চাপা শব্দ করছে। পাগলা কুকুর পিছনে-পিছনে আসছে, আমি এগুচ্ছি—ব্যাপারটা খুব ভয়াবহ। যে-কোনো মুহূর্তে এই কুকুর ছুটে এসে কামড়ে ধরতে পারে। আমি কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলাম। ঢিল ছুঁড়লাম, লাঠি দিয়ে ভয় দেখালাম। কুকুর নড়ে না, দাঁড়িয়ে থাকে। চাপা শব্দ করতে থাকে। আমি হাঁটতে শুরু কললেই সেও হাঁটতে শুরু করে। ····

'যাই হোক, আমি কোনোক্রমে নদীর পাড়ে এসে পৌছলাম। তখন আমার খানিকটা সাহস ফিরে এল। কারণ, পাগলা কুকুর পানিতে নামে না। পানি দেখলেই এরা ছুটে পালায়। ····

'অদ্ভুত কাণ্ড, কুকুর পানি দেখে ছুটে পালাল না! আমার পিছনে-পিছনে পানিতে নেমে পড়ল। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। ····

'আমি নদীর ও-পারে উঠলাম। কুকুরটাও উঠল—আর ঠিক তখন একটা ব্যাপার ঘটল।'

সুধাকান্তবাবু থামলেন।

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, 'আপনি জটিল জায়গাগুলিতে দয়া করে থামবেন না। গল্পের মজা নষ্ট হয়ে যায়।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'এটা কোনো গল্প না। ঘটনাটা কীভাবে বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না বলে থেমেছি।'

'আপনি মোটামুটিভাবে বলুন, আমি বুঝে নেব।'

'কুকুরটা আমার খুব কাছাকাছি চলে এল। পাগলা কুকুর আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন কিনা জানি না। ভয়ংকর দৃশ্য। সারাক্ষণ হাঁ করে থাকে। মুখ দিয়ে লালা পড়ে, চোখের দৃষ্টিটাও অন্য রকম। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি। ছুটে পালাব বলে ঠিক করেছি, ঠিক তখন কুকুরটা কেন জানি ভয় পেয়ে গেল। অস্বাভাবিক ভয়। একবার এ-দিকে যাচ্ছে, একবার ও-দিকে যাচ্ছে। চাপা আওয়াজটা তার গলায় আর নেই। সে ঘেউঘেউ করছে। আমার কাছে মনে হল, সে কুকুরের ভাষায় আমাকে কী যেন বলার চেষ্টা করছে। এ-রকম চলল মিনিট পাঁচেক। তার পরই সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে ও-পারে চলে গেল। পুরোপুরি কিন্তু গেল না, ও-পারে দাঁড়িয়ে রইল এবং ক্রমাগত ডাকতে লাগল।'

'তারপর?'

'আমি একটা সিগারেট ধরালাম। তখন আমি ধূমপান করতাম। মাস তিনেক হল ছেড়ে দিয়েছি। যাই হোক, সিগারেট ধরাবার পর ভয়টা পুরোপুরি কেটে গেল। হাত থেকে লাঠি ফেলে দিলাম। বাড়ির দিকে রওনা হব বলে ভাবছি, হঠাৎ মনে হল নদীর ধার ঘেঁষে বড়ো-হওয়া ঘাসগুলোর মাঝখান থেকে কী-একটা যেন নড়ে উঠল।'

'আপনি আবার ভয় পেলেন?'

'না, ভয় পেলাম না। একবার ভয় কেটে গেলে মানুষ চট করে আর ভয় পায় না। আমি এগিয়ে গেলাম।'

'কুকুরটা তখনো আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'তারপর বলুন।'

'কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা মেয়ের ডেডবডি। এগার-বার বছর বয়স। পরনে ডোরাকাটা শাড়ি।'

'বলেন কী আপনি!'

'যা দেখলাম তাই বলছি।'

'মেয়েটা যে মরে আছে তা বুঝলেন কী করে?'

'যে-কেউ বুঝবে। মেয়েটা মরে শক্ত হয়ে আছে। হাত মুঠিবদ্ধ করা। মুখের কষে রক্ত জমে আছে।'

'কী সর্বনাশ!'

'আমি দীর্ঘ সময় মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।'

'ভয় পেলেন না?'

'না, ভয় পেলাম না। আপনাকে তো আগেই বলেছি, একবার ভয় পেলে মানুষ দ্বিতীয় বার চট করে ভয় পায় না।'

'তারপর কী হল বলুন।'

'মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। বাচ্চা একটা মেয়ে এইভাবে মরে পড়ে আছে, কেউ জানছে না। কীভাবে না জানি বেচারি মরল। ডেডবডি এখানে ফেলে রেখে যেতে ইচ্ছা করল না। ফেলে রেখে গেলে শিয়াল–কুকুরে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। আমার মনে হল এই মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্যের কিছু নেই। আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও ঠিক তাই করতেন।'

'না, আমি তা করতাম না। চিৎকার করে লোক ডাকাডাকি করতাম।'

'আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই। কাকে আপনি ডাকতেন?'

'তারপর কী হল বলুন।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'আপনি আমাকে একটা সিগারেট দিন। সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে।'

আমি সিগারেট দিলাম। বৃদ্ধ সিগারেট ধরিয়ে খকখক করে কাশতে লাগলেন।

অমি বললাম, 'তারপর কী হল বলুন।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ঘটনাটা এখানে শেষ করে দিলে কেমন হয়? আমার কেন জানি আর বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছে না করলেও বলুন। এখানে গল্প শেষ করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'এটা গল্প না।'

'গল্প না যে তা বুঝতে পারছি। তারপর বলুন আপনি কী করলেন। মেয়েটাকে তুললেন?'

'হ্যাঁ তুললাম। কেন তুললাম সেটাও আপনাকে বলি। একটা অপরিচিত মেয়ের শবদেহ কেউ চট করে কোলে তুলে নিতে পারে না। আমি এই কাজটা করলাম, কারণ এই বালিকার মুখ দেখতে অবিকল ...'

সুধাকান্তবাবু থেমে গেলেন। আমি বললাম, 'মেয়েটি দেখতে ঐ মেয়েটির মতো, যার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা হয়েছিল। আরতি?'

'হ্যাঁ, আরতি। আপনার স্মৃতিশক্তি তো খুব ভালো!'

'আপনি আপনার গল্পটা বলে শেষ করুন।'

'মেয়েটি দেখতে অবিকল আরতির মতো। আমি মাটি থেকে তাকে তুললাম। মরা মানুষের শরীর ভারি হয়ে যায়, লোকে বলে। আমি দেখলাম মেয়েটার শরীর খুব হালকা। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, মেয়েটাকে তোলার সঙ্গে–সঙ্গে কুকুরটা চিৎকার বন্ধ করে দিল। আমার কাছে মনে হল চারদিক হঠাৎ যেন অস্বাভাবিক নীরব হয়ে গেছে। আমি মেয়েটাকে নিয়ে রওনা করলাম।'

'আপনার ভয় করল না?'

'না, ভয় করে নি। মেয়েটার জন্যে মমতা লাগছিল। আমার চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। কার–না–কার মেয়ে, কোথায় এসে মরে পড়ে আছে। বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। আমি কোলে করে একটা মৃতা বালিকা নিয়ে এসেছি, অথচ আমার মোটেও ভয় করছে না। আমি মেয়েটিকে ঘাড়ের উপর শুইয়ে রেখেই তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। তখন কেন জানি বুকটা কেঁপে উঠল। হাত–পা ঠাণ্ডা

হয়ে এল। আমি ভাবলাম ঘর অন্ধকার বলেই এ-রকম হচ্ছে, আলো জ্বাললেই ভয় কেটে যাবে। মেয়েটাকে আমি বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ····

'খাটের নিচে হারিকেন থাকে। আমি হারিকেন বের করলাম। ভয়টা কেন জানি ক্রমেই বাড়তে লাগল। মনে হল ঘরের বাইরে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে। যেন আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজনরা চলে এসেছে। আমার বাবা, আমার ঠাকুরদা, আমার ছোটপিসি—কেউ বাদ নেই। ওরা যে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে, তাও আমি শুনতে পাচ্ছি।····

'হারিকেন জ্বালাতে অনেক সময় লাগল। হাত কেঁপে যায়। দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যায়, সলতায় আগুন ধরতে চায় না। টপটপ করে আমার গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। শেষ পর্যন্ত হারিকেন জ্বলল। আমার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। আমি খাটের দিকে তাকালাম—এটা আমি কী দেখছি! এটা কি সম্ভব? এ-সব কী? আমি দেখলাম, মেয়েটা খাটের উপর বসে আছে। বড়-বড় চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল।। মনে হল মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি। ····

'স্পষ্ট শুনলাম উঠোন থেকে ভয়ার্ত গলায় আমার বাবা ডাকছেন, ও সুধাকান্ত, ও সুধাকান্ত, তুই বেরিয়ে আয়। ও সুধাকান্ত, তুই বেরিয়ে আয়। ও বাপধন, বেরিয়ে আয়।····

'আমি বেরিয়ে আসতে চাইলাম, পারলাম না। পা যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে গেছে। সমস্ত শরীর পাথর হয়ে গেছে। আমি মেয়েটির উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারলাম না। মেয়েটি একটু যেন নড়ে উঠল। কিশোরীদের মতো নরম ও কোমল গলায় একটু টেনে-টেনে বলল, ''তুমি একা-একা থাক। বড়ো মায়া লাগে গো! কত বার ভাবি তোমারে দেখতে আসব। তুমি কি আমারে চিনতে পারছ? আমি আরতি গো, আরতি। তুমি কি আমারে চিনছ?''····

'আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললাম, ''হ্যাঁ''। ····

''তোমার জন্যে বড় মায়া লাগে গো, বড় মায়া লাগে। একা-একা তুমি থাক। বড় মায়া লাগে। আমি কত ভাবি তোমার কথা। তুমি ভাব না?''····

'আমি যন্ত্রের মতো বললাম, ''ভাবি''। ····

'আমার মনে হল বাড়ির উঠোনে আমার সমস্ত মৃত আত্মীয়স্বজন ভিড় করেছে। আট বছর বয়সে আমার একটা বোন পানিতে পড়ে মারা গিয়েছিল। সেও ব্যাকুল হয়ে ডাকছে—ও দাদা, তুই বেরিয়ে আয় দাদা। আমার ঠাকুরমার ভাঙা-ভাঙা গলাও শুনলাম—ও সুধাকান্ত, সুধাকান্ত। ····

'খাটের উপর বসে-থাকা মেয়েটা বলল, ''তুমি ওদের কথা শুনতেছ কেন গো? এত দিন পরে তোমার কাছে আসলাম। আমার মনটা তোমার জন্যে কান্দে। ওগো, তুমি আমার কথা ভাব না? ঠিক করে বল—ভাব না?'' ····

''ভাবি।'' ····

''আমার গায়ে হাত দিয়ে বল, ভাবি। ওগো আমার গায়ে হাত দিয়ে বল।''····

'আমি একটা ঘোরের মধ্যে আছি। সবটাই মনে হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্নে সবই সম্ভব। আমি মেয়েটির গা স্পর্শ করবার জন্যে এগুলাম, তখনি আমার মৃতা মা উঠোন থেকে চেঁচালেন—খবরদার সুধাকান্ত, খবরদার! ····

'আমার ঘোর কেটে গেল। এ আমি কী করছি? এ আমি কী করছি? আমি হাতে ধরে রাখা হারিকেন ছুঁড়ে ফেলে ছুটে ঘর থেকে বেরুতে গেলাম। খাটের উপর বসে-থাকা মেয়েটি পিছন থেকে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার ডান পায়ের গোড়ালি কামড়ে ধরল। ভয়াবহ কামড়! মনে হল পায়ের হাড়ে সে দাঁত ফুটিয়ে দিয়েছে।....

'সে হাত দিয়ে আমাকে ধরল না। কামড়ে ধরে রাখল। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম বেরিয়ে যেতে। কিছুতেই পারলাম না। এতটুকু একটা মেয়ে—কী প্রচণ্ড তার শক্তি! আমি প্রাণপণে চেঁচালাম—কে কোথায় আছ, বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। তখন একটা ব্যাপার ঘটল। মনে হল কালো একটা কী-যেন উঠোন থেকে ঘরের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির উপর। চাপা গর্জন শোনা যেতে লাগল। মেয়েটি আমাকে ছেড়ে দিল। আমি পা টানতে-টানতে উঠোনে চলে এলাম।....

'উঠোনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম ভিতরে ধস্তাধস্তি হচ্ছে। ধস্তাধস্তি হচ্ছে ঐ পাগলা কুকুর এবং মেয়েটার মধ্যে। মেয়েটা তীব্র গলায় বলছে—ছাড়, আমাকে ছাড়।....

'কুকুরটা ক্রুদ্ধ গর্জন করছে। সেই গর্জন ঠিক কুকুরের গর্জনও নয়। অদেখা ভুবনের কোনো পশুর গর্জন। সেই গর্জন ছাপিয়েও মেয়েটির গলার স্বর শোনা যাচ্ছে—আমারে খাইয়া ফেলতাছে। ওগো তুমি কই? আমারে খাইয়া ফেলতাছে।'

সুধাকান্তবাবু থামলেন।

আমি বললাম, 'তারপর?'

তিনি জবাব দিলেন না। আমি আবার বললাম, 'তারপর কী হল সুধাকান্তবাবু?'

তিনি আমার দিকে তাকালেন। যেন আমার প্রশ্নই বুঝতে পারছেন না। আমি দেখলাম তিনি থরথর করে কাঁপছেন। আমি বললাম, 'কী হল সুধাকান্তবাবু?'

তিনি কাঁপা গলায় বললেন, 'ভয় লাগছে। দেয়াশলাইটা একটু জ্বালান তো!'

আমি দেয়াশলাই জ্বাললাম। সুধাকান্তবাবু তাঁর পা বের করে বললেন, 'দেখুন, কামড়ের দাগ দেখুন।'

আমি গভীর ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ও এখনো আসে। বাড়ির পিছনে থপথপ করে হাঁটে। নিঃশ্বাস ফেলে। জানালার পাট হঠাৎ করে বন্ধ করে দিয়ে ভয় দেখায়। হাসে। নাকী সুরে কাঁদে। একেক দিন খুব বিরক্ত করে। তখন ঐ কুকুরটাও আসে। হুটোপুটি শুরু হয়ে যায়। সাধারণত কৃষ্ণপক্ষের রাতেই বেশি হয়।'

আমি বললাম 'এটা কি কৃষ্ণপক্ষ?'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'না। চাঁদ দেখতে পাচ্ছেন না?'

আমি বললাম, 'আপনি তো ভাই ভয়াবহ গল্প শোনালেন। আমি তো এখন রাতে ঘুমুতে পারব না।'

'ঘুমানর দরকার নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্য উঠবে। চাঁদ ডুবে গেছে দেখছেন না?'

আমি ঘড়ি দেখলাম। চারটা বাজতে কুড়ি মিনিট। সত্যি-সত্যি রাত শেষ হয়ে গেছে।

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'চা খাওয়া যাক, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, খাওয়া যাক।'

তিনি চুলা ধরিয়ে কেটলি বসিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'বড়ো বিরক্ত করে। মাঝে-মাঝে ঢিল মারে টিনের চালে, থু-থু করে থুথু ফেলে। ভয় করে। রাতবিরাতে বাথরুমে যেতে হলে হাতে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে যেতে হয়। গলায় এই দেখুন একটা অষ্টধাতুর কবচ। কোমরে সবসময় একটা লোহার চাবি বাঁধা, তবু ভয় কাটে না।'

'বাড়ি ছেড়ে চলে যান না কেন?'

'কোথায় যাব বলেন? পূর্বপুরুষের ভিটে।'

'কাউকে সঙ্গে এনে রাখেন না কেন?'

'কেউ থাকতে চায় না রে ভাই, কেউ থাকতে চায় না।'

সুধাকান্তবাবু চায়ের কাপ হাতে তুলে দিলেন। চুমুক দিতে যাব, তখনি বাড়ির একটা কপাট শব্দ করে নড়ে উঠল। আমি চমকে উঠলাম। হাওয়ার কোনো বংশও নেই—কপাটে শব্দ হয় কেন?

আমি সুধাকান্তবাবুর দিকে তাকালাম। তিনি সহজ গলায় বললেন,'ভয়ের কিছু নেই—চা খান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হবে।'

বাড়ির পিছনের বনে খচমচ শব্দ হচ্ছে। আসলে আমি অস্থির বোধ করছি। এই অবস্থা হবে জানলে কে আসত এই লোকের কাছে! আমার ইচ্ছে করছে ছুটে পালিয়ে যাই। সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ভয় পাবেন না।'

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি একমনে মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন।

নিশ্চয়ই ভূত-তাড়ান মন্ত্র। আমি খুব চেষ্টা করলাম ছোটবেলায় শেখা আয়াতুল কুরসি মনে করতে। কিছুতেই মনে পড়ল না। মাথা পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে গেছে। গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে। ঠিকমতো নিঃশ্বাসও নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে বাতাসের অক্সিজেন হঠাৎ করে অনেকখানি কমে গেছে। ভয় নামক ব্যাপারটি যে কত প্রবল এবং কী-রকম সর্বগ্রাসী, তা এই প্রথম বুঝলাম।

একসময় ভোর হল।

ভোরের পাখি ডাকতে লাগল। আকাশ ফর্সা হল। তাকিয়ে দেখি গায়ের পাঞ্জাবি ভিজে জবজব করছে।

৩

আমার মামাতো ভাইয়ের বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হল না। মেয়ে কিছুতেই কবুল বলল না। যত বার বলা হল, 'মা, বল কবুল।'

তত বারই মেয়ে কঠিন গলায় বলল, 'না।'

আমি ছেলের পক্ষের সাক্ষীদের এক জন। বড় বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। মেয়ের এক খালা বললেন, 'আপনারা একটু পরে আবার আসুন। বাড়িতে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। মনটন খারাপ। বুঝতেই পারছেন।'

আমরা চলে এলাম। ঘন্টাখানেক পর আবার গেলাম। বলা হল,'মা, বল তো

কবুল।' মেয়েটি অস্ফুট গলায় কী-যেন বলল। মেয়ের খালা বললেন, 'এই তো বলেছে। মেয়েমানুষ চিৎকার করে বলবে নাকি? আমি শুনেছি, পরিষ্কার বলেছে। এখন যান, ছেলের কবুল নিয়ে আসুন।'

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'আমি কিছু শুনতে পাই নি। পরিষ্কার করে বলতে হবে।'

উকিল বললেন, 'মা, বল কবুল।'

মেয়েটি এবার স্পষ্ট করে বলল, 'না।' বলেই তীব্র চোখে আমার দিকে তাকাল। সেই চোখে রাগ ছিল, ঘৃণা ছিল, কিঞ্চিৎ অভিমানও ছিল। যেন সে বলছে—কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? তোমাদের পায়ে পড়ি, দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও।

আমি বললাম, 'বিয়ের ব্যাপারটা আপাতত বন্ধ থাকুক। শোকের ধাক্কাটা কমুক, তারপর দেখা যাবে।'

আমরা চলে এলাম। মফস্বলের ঐ শহরের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক রইল না। তবে শহরটার স্মৃতি আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধে রইল। স্মৃতির সবটুকুই গভীর বেদনার। আমার মামা ওখান থেকে ফিরে আসার পরপরই মাইয়ো কার্ডিয়াক ইনফ্রাকশানে মারা গেলেন। ছেলের বৌ দেখার খুব শখ ছিল, সেই শখ মিটল না। মামাতো ভাইটিও বিয়ে করতে রাজি হল না। বিচিত্র কারণে সে ঐ মেয়েটির ছবি বুকে পুষতে লাগল। শুধুমাত্র তার মুখের দিকে তাকিয়েই আবার বছরখানেক পর গেলাম ঐ শহরে। শুনলাম মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে—ছেলে ডাক্তার।

সুধাকান্তবাবুর সঙ্গেও দেখা হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না! যখন বললাম, 'আপনার সঙ্গে এক বার সারা রাত কাটালাম, আপনার কিছুই মনে নেই?' তিনি বললেন, 'ও আচ্ছা, মনে পড়েছে।' তাঁর চোখ-মুখ দেখেই বুঝলাম কথাগুলি তিনি ভদ্রতা করেই বললেন, আসলে কিছুই মনে পড়ে নি।

ভদ্রলোক আমাকে ভুলে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আমি তাঁকে মনে রেখেছি এবং বেশ ভালোভাবেই মনে রেখেছি। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই মনে হত। সেই অভিজ্ঞতায় আমারও কিছু অংশ আছে। কপাটের শব্দ আমি নিজের কানে শুনে এসেছি। বাতাস নেই, কিছু নেই, অথচ শব্দ করে কে যেন কপাট বন্ধ করল।

কাচের চুড়ির শব্দ। বাড়ির পিছনে খচখচ আওয়াজ—সবই আমার নিজের কানে শোনা।

সুধাকান্তবাবুর এই গল্প অনেকের সঙ্গেই করেছি। খুব আগ্রহ নিয়েই করেছি। ঝড়বৃষ্টির রাতে যখনি ভূতের গল্পের আসর বসেছে, আমি এই গল্প বলেছি। তবে গল্প তেমন জমাতে পারি নি। আমি যেমন অভিভূত হয়েছিলাম, আমি লক্ষ করেছি আমার গল্পের শ্রোতারা তার এক শ' ভাগের এক ভাগও হয় না। অথচ আমি নিজে খুব ভালো গল্প বলতে পারি। হয়তো পরিবেশ একটা ব্যাপার। সুধাকান্তবাবুর বাড়িতে আধোজ্যোৎস্নায় যে-পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, ঢাকা শহরের ড্রয়িংরুমে সেই পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব নয়। তবু এটি আমার একটি প্রিয় গল্প। যত বার এই গল্প বলেছি, তত বার ঐ রাতের কথা মনে পড়েছে—একধরনের শিহরণ বোধ করেছি।

৪

বছর তিনেক পরের কথা।

সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে। একটা 'সেমিনার টক' তৈরি করছি। বিষয়– পরিবেশ দূষণে পলিমারের ভূমিকা। চারদিকে কাগজপত্র, চার্ট, গ্রাফ নিয়ে বসেছি। সব এলোমেলো অবস্থায় আছে। ঠিক করে রেখেছি, কাজ শেষ না করে উঠব না।

মার্ফি'স ল বলে একটা ব্যাপার আছে। মার্ফি'স ল বলে– Anything that can go wrong, will go wrong—আমার বেলাও তাই হল। একের পর এক সমস্যা হতে লাগল। লিখতে গিয়ে দেখি বলপয়েন্টে কালি আসছে না। কালির কলম নিয়ে দেখা গেল ঘরে কালি নেই।

একের পর এক টেলিফোন আসতে লাগল। আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই এত দিন থাকতে আজই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। তাঁদের কথাও দেখি অনেক জমে আছে, কিছুতেই শেষ হয় না। আমি টেলিফোন রিসিভার উঠিয়ে রাখলাম। দোকান থেকে এক ডজন বলপয়েন্ট আনিয়ে বসলাম, আর তখন আমার বড় মেয়ে বলল, 'বাবা, এক জন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তোমাকে না বলেছি, কেউ এলে বলবে আমি বাসায় নেই?'

আমার মেয়ে বলল, 'আমি মিথ্যা বলতে পারি না, বাবা।'

'মিথ্য কথা বলতে পার না মানে? আমার তো ধারণা, তুমি সারাক্ষণই মিথ্যা কথা বল।'

'মঙ্গলবারে বলি না। মঙ্গলবার হচ্ছে সত্য–দিবস।'

অনেক কষ্টে রাগ সামলালাম। কিছু দিন আগে কী–একটা নাটকে দেখিয়েছে মঙ্গলবার সত্য–দিবস, সেদিন মিথ্যা বলা যাবে না।

আমি মনের বিরক্তি চেপে রেখে বসার ঘরে ঢুকলাম। অপরিচিত এক ভদ্রলোক বসে আছেন। অসম্ভব রোগা, লম্বা এক জন মানুষ—যাকে দেখলেই সরলরেখার কথা মনে হয়। এই গরমে গলায় একটা মাফলার। চোখে মোটা চশমা। ভদ্রলোক বসে আছেন মূর্তির মতো। মনে হচ্ছে ধ্যানে বসেছেন।

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। লম্বাটে মুখ। দাড়ি আছে। চুল লম্বা। দাড়ি, চুল, পরনের কালো কোট সবই কেমন যেন এলোমেলো। প্রথম দর্শনে মনে হয় ভবঘুরে ধরনের কেউ। তবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এই ভাবটা চলে যায়। মনে হয় লাজুক ধরনের একজন মানুষ এসেছেন। যে–কোনো কারণেই হোক মানুষটা বিব্রত বোধ করছেন।

আমি বললাম, 'আপনি কি আমার কাছে এসেছেন?'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জ্বি।'

'আজ আমি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত। আপনি কি অন্য একদিন আসতে পারেন?'

'জ্বি, পারি।'

'তাহলে তাই করুন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

বলেই ভদ্রলোক আবার বসে পড়লেন। আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। ভদ্রলোক বললেন, 'বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আপনি বোধহয় লক্ষ করেন নি। আমি সঙ্গে ছাতা আনি নি। বৃষ্টিটা কমলেই চলে যাব।'

আমি ফিরে এসে আমার কাজে মন দিলাম। তিন ঘন্টা একনাগাড়ে কাজ করলাম। অসাধ্যসাধন যাকে বলে। আর কোনো ঝামেলা হল না। মার্ফি সাহেবের আইন দেখা যাচ্ছে সবসময় কাজ করে না। আমি ভুলেই গেলাম যে বসার ঘরে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। কী কারণে যেন বসার ঘরে গিয়েছি, ভদ্রলোককে দেখে চমকে উঠলাম।

'আপনি আছেন এখনো?'

'জ্বি।'

'বৃষ্টি তো থেমে গেছে!'

'তা গেছে, কিন্তু কাউকে কিছু না-বলে যাই কী করে?'

আমি লজ্জিত বোধ করলাম। ভদ্রলোক দীর্ঘ সময় একা-একা বসে আছেন। বসার ঘরে কেউ আসে নি, কারণ আমার টিভি শোবার ঘরে। সবাই টিভির সামনে চোখ বড়-বড় করে বসে আছে। টিভিতে নিশ্চয়ই কোনো নাটক হচ্ছে।

আমি বললাম, 'আপনাকে কি ওরা চা দিয়েছে?'

'জ্বি-না।'

'চা খাবেন এক কাপ?'

'আরেক দিন যখন আসব, তখন খাব।'

আমি বললাম, 'আরেক দিন আসার দরকার নেই। আজই বলে ফেলুন। চট করে কি বলতে পারবেন?'

'না, পারব না। আমি আরেক দিন আসব।'

'আপনার নামটা তো জানা হল না।'

'আমার নাম মিসির আলি।'

'আমি কি আপনাকে চিনি?'

'জ্বি-না। চেনার কোনো কারণ নেই। আমি অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজি বিষয়ে পড়াশোনা করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টটাইম শিক্ষক।'

'আমার সঙ্গে আপনার যোগাযোগের কারণটা আমি বুঝতে পারছি না।'

'আরেক দিন যখন আসব, আপনাকে বুঝিয়ে বলব। আজ যাই, রাত হয়ে গেছে।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। ভদ্রলোককে বেশ আত্মভোলা লোক বলেও মনে হল। একটা পলিথিনের ব্যাগ ফেলে গেছেন। ব্যাগে একটা পাউরুটি এবং ছোট-ছোট দুটো কলা। মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের সকালবেলার নাশতা।

আমি বুঝতে পারলাম না, অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজির একজন অধ্যাপক আমার কাছে ঠিক কী চান? আমার আচার-আচরণে অস্বাভাবিক কিছু তো নেই। রহস্যটা কী?

৫

এক সপ্তাহ পর ভদ্রলোক আবার এলেন।

আমিই দরজা খুললাম। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

আমি বললাম, 'পারছি। আপনার নাম মিসির আলি। আপনি অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজির একজন অধ্যাপক। গত সপ্তাহে আমার এখানে এসে একটা পাউরুটি এবং দুটো কলা ফেলে গেছেন।'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। হাসিটি সুন্দর। শিশুর সারল্যমাখা। আজকাল মাপা হাসি ছাড়া আমরা হাসতে পারি না।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার মেয়েটাকে একটু ডাকবেন? তার জন্যে এক প্যাকেট চকলেট এনেছি।'

আমি খানিকটা বিরক্ত হলাম। অপরিচিত লোক দামী চকলেটের প্যাকেট নিয়ে এলে বুঝতে হবে কিছু ব্যাপার আছে।

'আবার চকলেট কেন?'

'আপনার জন্যে তো আনি নি, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন? আপনার মেয়েটিকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। পছন্দের মানুষকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে। আপনি কোনো রকম অস্বস্তি বোধ করবেন না। এই উপহারে কোনো রকম স্বার্থ জড়িত নেই। আমি আপনার কাছে কিছু চাইতে আসি নি।'

আমি খানিকটা লজ্জিত বোধ করলাম। ভদ্রলোককে ঘরে বসিয়ে চকলেটের প্যাকেট ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বললাম, 'কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

মিসির আলি বললেন, 'আপনার কাছে আমার এক কাপ চা পাওনা আছে। ঐ পাওনা চা খাওয়াতে পারেন।'

'চা আসবে। এখন আসল ব্যাপারটা বলুন।'

'আপনার কি কোনো তাড়া আছে?'

'না, তাড়া নেই।'

'আমি আপনার কাছে সুধাময়বাবু সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছি। আপনি যদি কষ্ট করে বলেন···'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সুধাময়বাবু কে?"

'আপনি এই নামে কাউকে চেনেন না?'

'জ্বি–না।'

'সুধাময়বাবুর বাড়িতে আপনি কি এক রাত কাটান নি, যেখানে আপনার একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়।'

'আপনি কি সুধাকান্তবাবুর কথা বলছেন?'

'নাম সুধাকান্ত হতে পারে। গল্পটা আমাকে যে বলেছে, সে সম্ভবত নামে গণ্ডগোল করেছে।'

আমি বললাম, 'আপনি কি আমাকে দয়া করে গুছিয়ে বলবেন, ব্যাপারটা কী? সুধাকান্তবাবুকে আমি ঠিকই চিনি। একটা অসাধারণ গল্প তাঁর মুখ থেকে শুনেছি।

আপনার সঙ্গে সেই গল্পের কী সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।'

মিসির আলি বললেন, 'আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তবে রহস্যময় ব্যাপারগুলোর প্রতি আমার একটা আগ্রহ আছে। পৃথিবীতে অনেক রহস্যময় ব্যাপার ঠিকই ঘটে। আবার অনেক কিছু ঘটে—যেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে খুব রহস্যময় মনে হলেও আসলে রহস্যময় নয়। আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই। সুধাকান্তবাবুর চরিত্র আমাকে খানিকটা কৌতূহলী করেছে, কারণ ওর চরিত্রে কিছু অস্বাভাবিক দিক আছে। ঐ সম্পর্কে আমি ভালোভাবে জানতে চাই। তা ছাড়া আপনার গল্পটাও বেশ মজার। এর মধ্যে এমন কিছু এলিমেন্ট আছে, যা প্রচলিত ভূতের গল্পে থাকে না।'

'আপনি কি ভূতের গল্প নিয়ে গবেষণা করছেন নাকি?'

'জ্বি–না। কিছু–কিছু গল্পের প্রতি একধরনের ফ্যাসিনেশন জন্মে যায়। ব্যাপারটা কী, ভালোমতো জানতে ইচ্ছে করে।'

'আমার গল্প আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন?'

'আমার এক ছাত্রের মুখে শুনেছি। সে শুনেছে আপনার কাছে। নাম হচ্ছে রুস্তম। তার কাছ থেকেই আমি আপনার ঠিকানা নিয়েছি।'

'আপনি বলছিলেন গল্পটাতে মজার কিছু এলিমেন্ট আছে, সেগুলো কী?'

'যেমন ধরুন কুকুরের ব্যাপারটা। একদল কুকুর সুধাকান্তবাবুকে ঘিরে ধরল। তারপর তাকে ঘিরে চক্রাকারে হাঁটতে লাগল এবং একটি বিশেষ দিকে নিয়ে যেতে লাগল। যেখানে নিয়ে গেল সেখানে একটা যুবতীর নগ্ন মৃতদেহ, যাকে কিছুক্ষণ আগেই হত্যা করা হয়েছে।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'এ–রকম কিছুই কিন্তু গল্পে নেই। কোনো নগ্ন যুবতীর মৃতদেহ পড়ে ছিল না। একটি বালিকার ডেডবডি ছিল। তার পরনে শাড়ি ছিল।'

মিসির আলি হাসতে–হাসতে বললেন, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। গল্প যখন এক জনের মুখ থেকে অন্য জনের মুখে যায়, তখন ডালপালা ছড়ায়। অনেক সময় মূল গল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জন্যেই আমি এসেছি আপনার মুখ থেকে গল্পটা শোনার জন্যে। যদি আপনার কষ্ট না হয়।'

'আমার কোনো কষ্ট হবে না। আমি আগ্রহ করে গল্পটা বলব।'

মিসির আলি কোটের পকেট থেকে নোট বই এবং কলম বের করলেন। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'আপনি কি নোট করছেন নাকি!'

'দু'–একটা পয়েন্ট লিখে রাখব। আমার স্মৃতিশক্তি ভালো, তবু মাঝে–মাঝে কিছু নোট রাখি। স্মৃতি মানুষকে প্রতারণা করে, লেখা করে না।'

চা চলে এল। চা খেতে–খেতে ভদ্রলোক গল্প শুনলেন। তবে গল্প বলে আমি কোনো আরাম পেলাম না। ভদ্রলোক গল্পের মাঝখানে একবারও বললেন না—অদ্ভুত তো! তারপর কী হল? কী আশ্চর্য!

তিনি পাথরের মতো মুখ করে গল্প শুনলেন এবং গল্প শেষ হওয়ামাত্র বললেন, 'আচ্ছা তাহলে যাই। আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না।'

আমি বললাম, 'আপনার কাজ হয়ে গেল?'

'জ্বি।'

'গল্পটা কি আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হয় নি?'

'জ্বি–না, ভূতের গল্প সাধরণত এ–রকমই হয়। নতুনত্ব কিছু নেই। আমার শুধু একটা প্রশ্ন, মেয়েটার ডেডবডি কি শেষ পর্যন্ত ছিল?'

'তার মানে?'

'এ–জাতীয় গল্পে ডেডবডি শেষ পর্যন্ত থাকে না। বাতাসে মিলিয়ে যায় কিংবা কুকুর খেয়ে ফেলে। আপনি জানেন, কী হয়েছিল?'

'আমি জানি না, আমি জিজ্ঞেস করি নি। আপনি গল্পটার কিছুই বিশ্বাস করেন নি, তাই না?'

'জ্বি–না।'

'কেন, দয়া করে বলবেন কি?'

'এই জাতীয় ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যখন হয়, তখন মানুষ খুব কনফিউজড্ অবস্থায় থাকে। কোনো ঘটনাই সে পরিষ্কার দেখে না। যা দেখে তাও সে গুছিয়ে বলতে পারে না। অথচ আপনার সুধাকান্তবাবু চমৎকারভাবে সব বর্ণনা করলেন। অতি সূক্ষ্ম ডিটেলও বাদ দিলেন না। এই জিনিস পাওয়া যায় তৈরি–করা গল্পে।'

আমি বললাম,'সব মানুষ তো এক রকম নয়। কিছু–কিছু মানুষ বিপর্যয়ের সময়ও মাথা ঠাণ্ডা রাখে।'

'তা রাখে। যেমন আমি নিজেই রাখি।'

'তার পরেও আপনি বললেন এটা একটা গল্প?'

'জ্বি।'

'কেন বলুন তো?'

'সুধাকান্তবাবু আপনার কথামতো একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ, সাধু–প্রকৃতির লোক। এই ধরনের একজন মানুষ বিপদে ঈশ্বরের নাম নেবে, গায়ত্রী মন্ত্র পড়বে। একজন নাস্তিক পর্যন্ত যে–কাজটা করবে, তিনি করেন নি। ঘটনা সত্যি–সত্যি ঘটলে তিনি তা অবশ্যই করতেন। যেহেতু ঘটনাটা বানান, কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা বাদ পড়েছে।'

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটার ওপর খানিকটা রাগ হচ্ছে। এককথায় সে বলে দিল গল্প বানান?

মিসির আলি বললেন, 'আপনার সঙ্গে যখন গল্প করছিলেন, তখন ভয় পেয়ে ভদ্রলোক মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন, অথচ ঐ রাতে করলেন না। ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

আমি বললাম, 'সুধাকান্তবাবু শুধু–শুধু এ–রকম একটা গল্প বানাবেন কেন? এই রকম একটা গল্প তৈরির পিছনে কোনো একটা কারণ থাকবে নিশ্চয়ই।'

'তা তো থাকবেই। তাঁরও আছে।'

'কী কারণ?'

'অনেক কারণ হতে পারে। তবে আমার যা মনে হয়, তা হচ্ছে উনি নিঃসঙ্গ ধরনের মানুষ, এই জাতীয় একটা গল্প তৈরি করে নিজে সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন। এটা এক জন নিঃসঙ্গ মানুষের জন্যে কম কথা নয়।'

মিসির আলি লোকটির প্রতি আমার ভক্তি হল। লজিক বা 'যুক্তি' নামক ব্যাপারটা যে কত শক্তিশালী হতে পারে, মিসির আলি তা আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে

দিলেন।

আমি বললাম, 'এই গল্পটা যে সত্যি, এটা আপনি কখন স্বীকার করবেন? অর্থাৎ কোন প্রমাণ উপস্থিত করলে আপনি গল্পটা মেনে নেবেন?'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'ঐ মেয়েটির ডেডবডি যদি অন্যরা দেখে থাকে এবং কবর দেওয়া হয় বা দাহ করা হয়, তবেই আমি ঘটনাটা মেনে নেব।'

'আমি আপনাকে খবরটা এনে দেব। আমি চিঠি লিখে খবরটা জোগাড় করব। আপনি আপনার ঠিকানা লিখে রেখে যান।'

মিসির আলি তাঁর ঠিকানা লিখে রেখে চলে গেলেন। আশ্চর্য কাণ্ড, আজও তাঁর পলিথিনের ব্যাগ ফেলে গেলেন। ব্যাগের ভেতর ছোট্ট একটা পাউরুটি, একটা কলা এবং এক টুকরো মাখন। গরমে সেই মাখন গলে ব্যাগময় ছড়িয়ে পড়েছে।

৬

চিঠি লিখলাম আমার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে যে-মেয়েটির বিয়ের কথা হয়েছিল, সেই মেয়ের বড়চাচাকে। আমার ধারণা ছিল ভদ্রলোক জবাব দেবেন না। যে-পরিচয়ের সূত্র ধরে চিঠি লিখেছি, সেই সূত্রে চিঠির জবাব দেওয়ার কথা নয়। ভদ্রলোক কিন্তু জবাব দিলেন। এবং বেশ গুছিয়েই জবাব দিলেন।

'আপনার পত্র পাইয়াছি।

এক নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় আপনাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। আপনি যে সেই পরিচয় মনে রাখিয়া পত্র দিয়াছেন তাহাতে কৃতজ্ঞ হইলাম। আপনি আমার ভাইস্তি প্রসঙ্গে জানিতে চাহিয়াছেন। দুই বৎসর আগে তাহার বিবাহ হইয়াছে। এই খবর তো আপনার জানা। সে এখন তাহার স্বামীর সহিত ইরাকে আছে। তাহার স্বামী একজন ডাক্তার। আপনাদের দোয়ায় তাহারা ভালোই আছে।

দ্বিতীয় যে-বিষয়টি আপনি জানিতে চাহিয়াছেন, তাহার সবই সত্য। কুকুরের কামড়ে ছিন্নভিন্ন বালিকাটির দেহ আমরা সবাই দেখিয়াছি। তাহার মৃতদেহ সৎকারের কোনো ব্যবস্থা হয় নাই, কারণ বালিকাটি হিন্দু কি মুসলিম তাহা জানা সম্ভব হয় নাই।

ঘটনাটি সেই সময় জনমনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার মফস্বল পাতায় খবরও ছাপা হইয়াছিল।

অধিক আর কি? আমরা ভালো আছি। আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।'

আমি চিঠিটি ডাকযোগে মিসির আলির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। মনে-মনে হাসলাম। অভ্রান্ত যুক্তিও মাঝে-মাঝে অচল হয়ে যায়। এই চিঠিটি হচ্ছে তার প্রমাণ।

চিঠি পাঠাবার তৃতীয় দিনের মাথায় মিসির আলি এসে উপস্থিত। আমি হেসে বললাম, 'কি, গল্পটা এখন বিশ্বাস করলেন?'

মিসির আলি শুকনো গলায় বললেন, 'হুঁ।'

তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হল।
আমি বললাম, 'আপনাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন?'
মিসির আলি বললেন, 'আমি আপনার কাছ থেকে গল্পটা আবার শুনতে চাই।'
'কেন?
'প্লীজ, আরেক বার বলুন।'
'আবার কেন?'
'বলুন শুনি।'
আমি দ্বিতীয় বার গল্পটা শুরু করলাম। এক জায়গায় মিসির আলি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কত তারিখ বললেন?'
'বারই কার্তিক। এই তারিখে ঘটনাটা ঘটল।'
'বারই কার্তিক তারিখটা আপনার মনে আছে?'
'হ্যাঁ, আছে। প্রথম বার যখন আপনাকে গল্পটা বলি, তখনও তো বারই কার্তিক বলেছিলাম বলে আমার মনে হয়।'
'হ্যাঁ, বলেছিলেন। আজও সেই একই তারিখ বলেন কি না তাই দেখতে চেয়েছি। এই তারিখটা বেশ জরুরি।'
'জরুরি কেন?'
'বলছি কেন। তার আগে আপনি বলুন বার তারিখটা আপনার মনে রইল কেন? এ-সব দিন-তারিখ তো আমাদের মনে থাকে না।'
'বার তারিখ আমার বড়মেয়ের জন্মদিন। কাজেই সুধাকান্তবাবু বার তারিখ বলামাত্র আমার মনে গেঁথে গেল। তা ছাড়া আমার স্মৃতিশক্তি ভালো।'
'তাই তো দেখছি!'
'এখন বলুন তারিখটা এত জরুরি কেন?'
'যে-বছরে ঘটনাটা ঘটল, আমি সেই বছরের পঞ্জিকা দেখেছি। বার তারিখ হচ্ছে ২৪শে অক্টোবর। স্কুল ছুটি থাকে। ঐদিন লক্ষ্মীপূজার বন্ধ। কাজেই আপনার সুধাকান্তবাবু আপনাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ঐদিন স্কুল করেছেন।'
'হয়তো উনিই তারিখটা ভুল বলেছেন।'
'হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে আমি তাঁর নিজের মুখে ঘটনাটা শুনতে চাই।'
'আবার শুনতে চান?'
'হ্যাঁ।'
'কেন?'
'ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছি না।'
আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বিশ্বাস করতে না চাইলে করবেন না। আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে এমন কোনো কথা আছে?'
মিসির আলি বললেন, 'আপনি কি একটু যাবেন আমার সঙ্গে?'
'কোথায়?'
'ঐ জায়গায়।'
'কেন?'
'তাহলে জেনে আসতাম তারিখটা বার কিনা।'

'আপনি কি পাগল নাকি ভাই?'

মিসির আলি বললেন, 'ব্যাপারটা খুব জরুরি। আমাকে জানতেই হবে।'

'জানতে হলে আপনি যান। আমি আপনাকে ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনি যাবেন না?'

'জ্বি–না। আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানর সময় আমার নেই।'

'এটা আজেবাজে ব্যাপার না।'

'আমার কাছে আজেবাজে। আমার যাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

মিসির আলি মুখ কালো করে উঠে গেলেন। আমি মনে–মনে বললাম, ভালো পাগলের পাল্লায় পড়েছি। লোকটা মনে হল অ্যাবনর্ম্যাল। অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজি করতে–করতে নিজেও ঐ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরা দেখি বিপজ্জনক ব্যক্তি!

মিসির আলি যে কী পরিমাণ বিপজ্জনক ব্যক্তি তা টের পেলাম দিন দশেক পর। আমার ঠিকানায় মিসির আলির এক চিঠি এসে উপস্থিত।

'ভাই,

আপনি কেমন আছেন?

আমি সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা হয় নি। উনি তাঁর দূর সম্পর্কের এক বোনের বাড়ি চলে গিয়েছেন বলে দেখা হয় নি। শুনলাম, তিনি সেখানে পুরো গরমের ছুটিটা কাটাবেন। যাই হোক, ওঁর অনুপস্থিতিতে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। থানায় গিয়ে থানার রেকর্ডপত্র দেখেছি। ঐখানে ঘটনার তারিখ ২৩শে অক্টোবর দিবাগত রাত। অর্থাৎ ১১ই কার্তিক। কাজেই সুধাকান্তবাবু তারিখ বলায় একটু ভুল করেছেন বলে মনে হয়। আমি স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গেও কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, ঐদিন সুধাকান্তবাবু ঠিকই সারা দিন ক্লাস করেছেন। কাজেই সুধাকান্তবাবু মিথ্যা বলেন নি। তারিখে ভুল করেছেন।

তারিখ ভুল করা খুব অস্বাভাবিক নয়। ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তি তেমন ভালো না। কারণ আপনার মুখেই শুনেছি দ্বিতীয় বার যখন তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়, তখন তিনি আপনাকে চিনতে পারেন নি।

থানার ওসি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম—পোস্টমর্টেম করা হয়েছিল কি?

উনি বললেন—পোস্টমর্টেমের মতো অবস্থা ছিল না। কুকুর সব ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। ছিন্নভিন্ন কিছু অংশ ছড়িয়ে ছিল। গ্রামের অন্যরাও তাই বলল।

মেয়েটি কোথাকার তাও জানা যায় নি। আমি এত দিন পর এ–সব খোঁজ করছি দেখে তারা প্রথমে একটু অবাক হলেও পরে আমাকে আগ্রহ করে সাহায্য করেছে, কারণ তাদের বলেছি আমার কাজই হচ্ছে রহস্যময় ঘটনা সংগ্রহ করা। গ্রামবাসীদের ধারণা, মেয়েটির অশরীরী আত্মা এখনো ঐ বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। নানান রকম শব্দ শোনা যায়। মেয়েলি কান্না, দরজা–জানালা আপনা–আপনি বন্ধ হওয়া—এইসব। আমি ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে দু' রাত এই বাড়ির উঠোনে বসে ছিলাম। তেমন কিছু দেখি নি বা শুনি নি। তবে এক বার বাড়ির পিছনে মানুষ দৌড়ে যাবার শব্দ শুনেছি। এটা শেয়ালের দৌড়ে যাবার শব্দও হতে পারে। সারা জীবন শহরে মানুষ হয়েছি বলে এই জাতীয় শব্দের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয়

নেই।

আপনাকে চিঠিতে সব জানাচ্ছি, কারণ আমার শরীরটা খুবই খারাপ। ওখান থেকে এসেই প্রবল জ্বরে পড়ে যাই। এক বার রক্তবমি হয় বলে ভয় পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। এখন আছি মিডফোর্ড হাসপাতালে। ওয়ার্ড দু' শ' তেত্রিশ। বেড নাম্বার সতের। আপনি যদি আসেন তাহলে খুব খুশি হব। সুধাকান্তবাবু প্রসঙ্গে একটা জরুরি আলাপ ছিল। আশা করি আপনি ভালো আছেন।'

আমি এই চিঠি ফেলে দিলাম। একটা পাগল লোককে শুরুতে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়েছি বলে আফসোস হতে লাগল। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এই লোক আমার পিছনে জোঁকের মতো লেগে থাকবে এবং জীবনটা অস্থির করে তুলবে।

তাকে হাসপাতালে দেখতে যাবার পিছনেও কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। দেখতে যাওয়া মানে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া। দূরে-দূরে থাকাই ভালো। দেখা হলে বলা যাবে—চিঠি পাই নি। বাংলাদেশে চিঠি না-পাওয়া এমন কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার না। খুবই স্বাভাবিক।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, হাসপাতালেই নিতান্ত কাকতালীয়ভাবে মিসির আলির সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। টেম্পোর সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট করে আমার এক কলিগ পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁকে দেখে ফিরে আসছি, হঠাৎ শুনি পিছন থেকে চিকন গলায় কে যেন আমাকে ডাকছে, 'হুমায়ূন সাহেব। এই যে হুমায়ূন সাহেব।'

তাকিয়ে দেখি আমাদের মিসির আলি।

বিছানার সঙ্গে মিশে আছেন। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। চিঁচিঁ আওয়াজ হচ্ছে। আমি বললাম, 'আপনার এ কী অবস্থা!'

'অসুখটা কাহিল করে ফেলেছে। গত কাল পর্যন্ত ধারণা ছিল মারা যাচ্ছি। আজ একটু ভালো।'

'ভালোর বুঝি এই নমুনা?'

'রক্ত পড়াটা বন্ধ হয়েছে। তবে ব্যথা সারে নি। ভাই, বসুন। আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন, বড়ই আনন্দ হচ্ছে। আসছেন না দেখে ভাবছিলাম হয়তো চিঠি পান নি।'

আমি খানিকটা লজ্জিত বোধ করতে লাগলাম। একবার ইচ্ছা হল সত্যি কথাটা বলি। বলি যে, তাঁকে দেখতে আসি নি, ভাগ্যচক্রে দেখা হয়ে গেল। পরক্ষণেই মনে হল, সব সত্যি কথা বলতে নেই।

'হুমায়ূন সাহেব।'

'জ্বি?'

'বসুন ভাই, একটু বসুন।'

আমি বসলাম। মিসির আলি বললেন, 'আপনাকে দেখে ভালো লাগছে। একটা বিশেষ কারণে মনটা খুব খারাপ ছিল।'

'বিশেষ কারণটা কী?'

'এগার নম্বর বেডটার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আলসারের পেশেন্ট। কিছু খেতে পারে না। হাসপাতাল থেকে যে-খাবার দেয়, সবটাই রেখে দেয়। তখন কী হয় জানেন,

তার ছোটভাই সেটা খায়। খুব তৃপ্তি করে খায়। দিন-রাত বড় ভাইয়ের কাছে সে যে বসে থাকে, ঐ খাবারের আশাতেই বসে থাকে। আজ কী হয়েছে জানেন? বড়ভাইয়ের শরীর বোধহয় একটু ভালো হয়েছে, সে তার খাবার সব খেয়ে ফেলেছে। ছোট ভাইটা অভুক্ত অবস্থায় সারা দিন বসে আছে। অসম্ভব কষ্ট হয়েছে আমার, বুঝলেন। চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আমাদের দেশের মানুষগুলো এত গরিব কেন বলুন তো ভাই?'

আমি মিসির আলির প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। এগার নম্বর বেডের দিকে তাকালাম। ষোল-সতের বছরের এক জন যুবক অসুস্থ ভাইয়ের পাশে বসে আছে। আমি বললাম, 'ছেলেটি কি এখনো না-খেয়ে আছে?'

'হ্যাঁ। আমি নার্সের হাতে তার জন্যে পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়েছিলাম। সে রাখে নি। বড়ই কষ্ট হচ্ছে হুমায়ূন সাহেব।'

আমি মিসির আলির হাত ধরলাম। এই প্রথম বুঝলাম—এই মানুষটি আমাদের আর দশটি মানুষের মতো নয়। এই রোগা আধপাগলা মানুষটির হৃদয়ে সমুদ্রের ভালবাসা সঞ্চিত আছে। এদের স্পর্শ করলেও পুণ্য হয়।

'হুমায়ূন সাহেব।'

'জ্বি?'

'এই খাতাটা আপনি মনে করে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।'

'কী খাতা?'

'সুধাকান্তবাবুর বিষয়ে এই খাতায় অনেক কিছু লিখে রেখেছি। বাসায় নিয়ে মন দিয়ে পড়বেন।'

'শরীরের এই অবস্থায়ও আপনি সুধাকান্তবাবুকে ভুলতে পারেন নি?'

'হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে এইটা নিয়েই শুধু ভাবতাম। কিছু করার ছিল না তো। অনেক নতুন-নতুন পয়েন্ট ভেবে বের করেছি। সব লিখে ফেলেছি।'

'ভালো করেছেন। এখন বিশ্রাম করুন। আমি খাতা নিয়ে যাচ্ছি। কাল আবার আসব।'

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, 'এক বার কি চেষ্টা করে দেখবেন ঐ ছেলেটিকে বাইরে নিয়ে কিছু খাওয়ান যায় কি না?'

'আমি দেখব। আপনি এই নিয়ে ব্যস্ত হবেন না।'

'আমি ব্যস্ত হচ্ছি না।'

চলে আসার আগে-আগে মিসির আলি বললেন, 'আপনি কষ্ট করে আমাকে দেখতে এসেছেন, আমি খুবই আনন্দিত।'

আমি আবার লজ্জা পেলাম।

৭

ব্যক্তিগত কাজ অনেক জমে ছিল, মিসির আলির খাতা নিয়ে বসা হল না। আমি তেমন উৎসাহও বোধ করছিলাম না। সামান্য গল্প নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ির আমি কোনো অর্থ দেখি না। আমি লক্ষ করেছি—গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বেশির ভাগ মানুষ সম্পূর্ণ অবহেলা

করে, মাতামাতি করে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। মিসির আলিও নিশ্চয় এই গোত্রের। পরিবার-পরিজনহীন মানুষদের জন্যে এর অবশ্যি প্রয়োজন আছে। কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা—জীবন পার করে দেওয়া।

এক রাতে শোবার আগে খাতা নিয়ে বসলাম। পাতা উল্টে আমার আক্কেলগুড়ুম। এক শ' ছিয়াশি পৃষ্ঠার ঠাসবুনোন লেখা। সুধাকান্তবাবু এবং তার গল্প নিয়ে যে এত কিছু লেখা যায় কে জানত! পরিষ্কার গোটা-গোটা লেখা। পড়তে খুব আরাম।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আমাকে নিয়ে তিনি আট পৃষ্ঠা লিখেছেন। সেই অংশটিই প্রথম পড়লাম। শুরুটা এ-রকম—

'নাম : হুমায়ূন আহমেদ।

বিবাহিত, তিন কন্যার জনক। পেশা অধ্যাপনা।

বদমেজাজি। অহঙ্কারী। অধ্যাপকদের যেটা বড় ত্রুটি—অন্যদের বুদ্ধিমত্তা খাটো করে দেখা, ভদ্রলোকের তা আছে।

এই ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তি ভালো। তিনি গল্পটি দু' বার আমাকে বলেছেন। দু' বারই এমনভাবে বলেছেন যে, একটি শব্দ এদিক-ওদিক হয় নি। তাঁর কথাবার্তায় চিরকুমার সুধাকান্তবাবুর প্রতি গভীর মমতা টের পাওয়া যায়। এই মমতার উৎস কী?

সুধাকান্তবাবু এই ভদ্রলোককে ক্ষুধার্ত অবস্থায় চমৎকার কিছু খাবার রান্না করে খাইয়েছেন—এইটাই কি একমাত্র কারণ? আমার মনে হয় সুধাকান্তবাবুর চেহারা, কথাবার্তাও ভদ্রলোকের ওপর খানিকটা প্রভাব ফেলেছে। সুধাকান্তবাবু অতি অল্প সময়ে এই বুদ্ধিমান মানুষটিকে প্রভাবিত করেছেন। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সুধাকান্তবাবুর আছে। আমরা তাহলে কি ধারণা করতে পারি না, সুধাকান্তবাবু তাঁর আশেপাশের মানুষদেরও প্রভাবিত করেছেন?'

সুধাকান্তবাবুকে নিয়ে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম—পূর্বপরিচয়। এই অংশে সুধাকান্তবাবুর পরিবারের যাবতীয় বিবরণ আছে।

বাবার নাম, দাদার নাম, মার নাম। তাঁরা কে কেমন ছিলেন, কী করতেন। কে কীভাবে মারা গেলেন। দেশত্যাগ করলেন কবে। কেন করলেন। এত তথ্য ভদ্রলোক কীভাবে জোগাড় করলেন, কেনই-বা করলেন কে জানে!

দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম—সুধাকান্তবাবু ও তাঁর বাগদত্তা। এই অধ্যায়টি বেশ ছোট। পড়ে মনে হল মিসির আলি তেমন কোনো তথ্য জোগাড় করতে পারেন নি।

তৃতীয় অধ্যায় সুধাকান্তবাবুর চরিত্র এবং মনমানসিকতা নিয়ে। শুরুটা এমন—

ভদ্রলোক নিজেকে সাধুশ্রেণীতে ফেলেছেন। শুরুতেই তিনি বলছেন যে, সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনযাত্রায় তাঁর আগ্রহ আছে। শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরতেন, এবং স্থানীয় লোকজনও তাঁকে সাধুবাবা বলে। নিজের সাধু-চরিত্রটির প্রতি ভদ্রলোকের দুর্বলতা আছে। এই দুর্বলতার কারণ কী? প্রকৃত সাধুশ্রেণীর লোক শুরুতেই অন্যকে বলে না—আমি সাধু। ইনি তা বলছেন, কাজেই ধরে নেওয়া যাক ইনি আমাদের মতোই দোষগুণসম্পন্ন সাধারণ একজন মানুষ।

তিনি নিঃসঙ্গ জীবন ঠিক পছন্দ করেন বলেও মনে হল না। অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন, যাতে একা-একা খুব অল্প সময় তাঁকে থাকতে হয়। এক জন সাধকশ্রেণীর মানুষের চরিত্রের সঙ্গেও ব্যাপারটা মিশ খায় না।...

মিসির আলির খাতা শেষ করতে-করতে রাত দুটো বেজে গেল। পরিশিষ্ট অংশে ভদ্রলোক ছ'টি প্রশ্ন তুলেছেন। এবং বলছেন—রহস্য উদ্ধারের জন্যে এই প্রশ্নগুলির জবাব জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ছ'টি প্রশ্ন পড়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। এ কী কাণ্ড! মিসির আলি সাহেবের খাতা আবার গোড়া থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়লাম। ছ'টা প্রশ্নের কাছে এসে আবার চমকালাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। ইচ্ছে করল এক্ষুণি ছুটে যাই মিসির আলির কাছে।

৮

মিসির আলি সাহেব আজ অনেক সুস্থ। গায়ে চাদর জড়িয়ে বিছানায় বসে আছেন। হাতে শিবরাম চক্রবর্তীর বই 'জন্মদিনের উপহার'। কিছুক্ষণ পড়ছেন, তারপর গা দুলিয়ে হাসছেন। আবার পড়ছেন, আবার হাসছেন।

আশেপাশের রুগীরা ব্যাপারটায় বেশ মজা পাচ্ছে। আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে তারা দেখছে এই বিচিত্র মানুষটাকে।

আমার দিকে চোখ পড়তেই মিসির আলি বললেন, 'শিবরামের বাঘের গল্পটা পড়েছেন? অসাধারণ! সকাল থেকে এখন পর্যন্ত এগার বার গল্পটা পড়লাম।'

'তাই নাকি?'

'আমার কী মনে হয় জানেন? হাসপাতালের রুগীদের জন্যে এই জাতীয় বই অষুধপত্রের সঙ্গে দেওয়া দরকার। প্রাণখুলে কয়েক বার হাসতে পারলে যে-কোনো অসুখ অনেকটা কমে যায় বলে আমার ধারণা।'

'আপনার তাহলে কমে গেছে?'

'জ্বি।'

আমি বললাম, 'আপনার খাতাটা কাল রাতে পড়ে শেষ করেছি। আমার মনে হয়, যে-ছ'টি প্রশ্ন আপনি তুলেছেন, তার উত্তর জানা প্রয়োজন।'

'প্রয়োজন তো বটেই।'

'আমি আপনার সঙ্গে যাব এবং সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে কথা বলব।'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'আমি জানতাম আপনি এই কথা বলবেন।'

আমি বললাম, 'কোনো-একটা ভৌতিক গল্প শুনলেই কি আপনি এ-রকম করেন, সব রহস্য উদ্ধারের জন্যে লেগে পড়েন?'

মিসির আলি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

আমি বললাম, 'আপনি কি আপনার শোনামতো ভৌতিক গল্পের রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন?'

'না, পারি নি। শতকরা বিশ ভাগ ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারি নি। আমার আরেকটা খাতা আছে। ঐ খাতার নাম রহস্য-খাতা। যে-সব সমস্যা আমি সমাধান করতে পারি নি, রহস্য-খাতায় সেইসব লিখে রেখেছি। আপনাকে একদিন পড়তে দেব।'

'ঠিক আছে। আপনার "রহস্য-খাতা" একদিন পড়ব।'

'কিংবা আপনি যদি চান তাহলে ঐখানকার একটা গল্প আপনাকে শোনাতেও পারি।'

'এইখানে বলবেন?'

'অসুবিধা কী? হাসপাতালে একটা ক্যান্টিন আছে। ক্যান্টিনে বসে চা খেতে-খেতে গল্পটা আপনাকে বলতে পারি। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন—আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে। একটা গল্প যদি শুরু করি, তাহলে ভদ্রতার কারণেই আপনি গল্প শেষ না-করা পর্যন্ত বসে থাকবেন। এটাই হচ্ছে আমার লাভ।'

'আপনার শরীরের এই অবস্থায় আপনি ক্যান্টিনে যেতে পারবেন?'

'পারব। আমাকে যতটা কাহিল দেখাচ্ছে, ততটা কাহিল কিন্তু না। আসুন যাই।'

আমরা ক্যান্টিনে বসলাম।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম হাসপাতাল নোংরা হলেও ক্যান্টিনটা বেশ পরিষ্কার। ভিড় আছে, তবে হৈচৈ নেই। দু' ধরনের চা পাওয়া যাচ্ছে—এক নম্বরী চা এবং দু' নম্বরী চা। এক নম্বরী চা এক টাকা করে, দু' নম্বরীটা তিন টাকা করে। মিসির আলি বললেন, 'একই চা দু' ধরনের কাপে দেওয়া হয় বলে দু' ধরনের দাম। এবং মজার ব্যাপার কী জানেন, সবাই কিন্তু বেশি দামের চা'টা খাচ্ছে। গতকালও চা খেতে এসেছিলাম। এক জনকে বলতে শুনলাম—'এক নম্বরী চা মুখে দেওয়া যায় না। খানিকটা পানি গরম করে এনে দিয়ে দেয়।'

আমি বললাম, 'আপনি কি নিশ্চিত যে দুটো চা-ই এক?'

'হ্যাঁ, নিশ্চিত। প্রমাণ করে দিতে পারি। করব?'

'না, প্রমাণ করতে হবে না। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। এখন আপনার গল্পটা বলুন।'

'আপনার কি তাড়া আছে?'

'না, তাড়া নেই। তবু বেশিক্ষণ হাসপাতালে থাকতে আমার ভালো লাগে না।'

মিসির আলি সঙ্গে-সঙ্গে গল্প শুরু করলেন—

'রহস্য-খাতায় এই গল্পের নম্বর হচ্ছে একুশ। অর্থাৎ এটা একুশ নম্বর গল্প। এর চেয়ে অনেক ভয়ংকর গল্প আমার স্টকে আছে, তবু এটা বলছি, কারণ এটা বলতে গেলে একটা ফার্স্ট-হ্যাণ্ড স্টোরি। আমার নিজের জীবনে ঘটে নি, তবে যার জীবনে ঘটেছে, সে আমার প্রিয় এক মানুষ। ঘটনাটার সঙ্গে আমার যোগাযোগও প্রত্যক্ষ।—

'মেয়েটি হচ্ছে আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া—আমার মা'র মামাতো বোনের মেয়ে। গ্রামের মেয়ে। হোস্টেলে থেকে ময়মনসিংহ মমিনুন্নেসা কলেজে পড়ত। সেকেন্ড ইয়ারে উঠে হঠাৎ করে তার বিয়ে হয়ে যায়। খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়। ছেলের অর্থ, বিত্ত এবং প্রতিপত্তির কোনো অভাব নেই। পরিবারটিও এ-দেশের নাম-করা পরিবার। নাম বললেই আপনি চিনবেন, তাই নাম বলছি না। শুধু ধরে নিন যে, এই দেশের রাজনীতিতে এই পরিবারটির প্রত্যক্ষ যোগ আছে।'

'আপনি গল্পটা বলুন। বিত্তবান পরিবারের ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই।'

'আমার নিজেরও নেই এবং আমার ঐ খালার মেয়েটিরও ছিল না। অত্যন্ত

ক্ষমতাবান একটি পরিবারে বিয়ে হবার কারণে তার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। কিছুদিন স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরল। সেই বছর পরীক্ষা দেওয়া হল না। তার পরের বছরও হল না, কারণ সে তখন কনসিভ করেছে।-

'সমস্যা শুরু হল তখন, যখন মেয়েটি বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখতে লাগল। প্রতিটি স্বপ্নের মূল বিষয় একটিই—ছোট্ট একটা ছেলে এসে তাকে বলে : মা, তোমাকে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। আমাকে এরা মেরে ফেলবে। যে-রাতে আমার জন্ম হবে সেই রাতেই ওরা আমাকে মারবে। তুমি আমাকে রক্ষা কর। · · · ·

'বুঝতেই পারছেন, গর্ভবতী একটি মেয়ের কাছে এই জাতীয় স্বপ্ন কতটা ভয়াবহ। মেয়েটি অস্থির হয়ে পড়ল। খেতে পারে না, ঘুমুতে পারে না, এবং প্রায় রোজই এই জাতীয় স্বপ্ন দেখে। · · · ·

'আমার সঙ্গে মেয়েটির তখন যোগাযোগ হয়। আমি তাকে নানানভাবে বুঝিয়ে বলি যে এটা কিছুই না। গর্ভবতী মেয়েদের অবচেতন মনে একটা মৃত্যুভয় থেকেই যায়। সেই ভয় নানানভাবে প্রকাশ পায়। তোমার বেলায় এইভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। · · · ·

'মেয়েটির স্বামী বিষয়টি নিয়ে খুব বিব্রত বোধ করছিল। সে ঠিক করে রেখেছিল যে মেয়েটির মনের শান্তির জন্যে ডেলিভারির ব্যাপারটা এ-দেশে না করে বিদেশের কোনো হাসপাতালে করা হবে। · · · ·

'সেটা সম্ভব হল না। আট মাসের শেষে হঠাৎ করে মেয়েটির ব্যথা উঠল। তাড়াহুড়ো করে তাকে নিয়ে যাওয়া হল ঢাকার নামকরা একটা ক্লিনিকে। নর্ম্যাল ডেলিভারি হল। রাত দুটোয় মেয়েটি একটি পত্রসন্তান প্রসব করল।'

মিসির আলি থামলেন। ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'অনেকের সঙ্গে আমিও ক্লিনিকে অপেক্ষা করছিলাম। মেয়েটি আমার একজন রুগী, কাজেই আমার খানিকটা দায়িত্ব আছে। ক্লিনিকের পরিচালক একজন মহিলা ডাক্তার। তিনি আমাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'যে-বাচ্চাটির জন্ম হয়েছে তাকে একটু দেখুন।' · · · ·

'আমি দেখলাম।

'একটা গামলার ভেতর বাচ্চাটিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। জেলি ফিস আপনি দেখেছেন কি না জানি না, শিশুটির সমস্ত শরীর জেলি ফিসের মতো স্বচ্ছ, থলথলে, গাঢ় নীল রঙ। শুধু মাথাটা মানুষের। মাথাভর্তি রেশমি চুল। বড়-বড় চোখ। হাত-পা কিছু নেই। অক্টোপাসের মতো নলজাতীয় কিছু জিনিস কিলবিল করছে। · · · ·

'আমি খুবই সাহসী মানুষ, কিন্তু এই দৃশ্য দেখে ভয়ে গা কাঁপতে লাগল।

'ডাক্তার সাহেব বললেন, "এই শিশুটিকে আপনি কী করতে বলেন?" ···

'আমি বললাম, "আমার বলায় কিছু আসে-যায় না। বাচ্চার বাবা-মা কী বলেন?"

"বাচ্চার মাকে জানান হয় নি। তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। বাচ্চার বাবা চান না বাচ্চা বেঁচে থাকুক।" · · · ·

'আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, "এ-রকম অ্যাবনর্ম্যাল বাচ্চা এম্নিতেই মারা যাবে। আমাদের মারতে হবে না। প্রকৃতি এত বড় ধরনের অ্যাবনর্ম্যালিটি সহ্য করবে না।"

'আমি কিছু বললাম না। বাচ্চাটিকে ফুল স্পীড ফ্যানের নিচে রেখে দেওয়া হল। প্রচণ্ড শীতের রাত, বাচ্চাটির মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, এতেই তার মরে যাওয়া উচিত, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার—ভোর পাঁচটায় দেখা গেল, বাচ্চা দিব্যি সুস্থ। বড়-বড় চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, শিস দেওয়ার মতো শব্দ করছে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় সবার সম্মতি নিয়ে বাচ্চাটিকে এক শ' সিসি ইমাডোজল ইনজেকশন দেওয়া হল। যে-কোনো পূর্ণবয়স্ক লোক এতে মারা যাবে, কিন্তু তার কিছু হল না। শুধু শিস দেওয়ার ব্যাপারটা একটু কমে গেল। ভোর ছ'টায় দেওয়া হল পঞ্চাশ সিসি এট্রোজিন সল্যুশন। বাচ্চাটা মারা গেল ছ'টা বিশে। বাচ্চার মা জানতে পারল না। সে তখনো ঘুমে অচেতন।'

মিসির আলি গল্প শেষ করলেন। আমি বললাম, 'তারপর?'

'তারপর আবার কি? গল্প শেষ।'

'বাচ্চাটির মা'র কী হল?'

'বাচ্চার মা'র কী হল তা দিয়ে তো আমাদের প্রয়োজন নেই। রহস্য তো এখানে নয়। রহস্য হচ্ছে বাচ্চার মা যে-স্বপ্নগুলি দেখত সেখানে। সেই রহস্য আমি ভেদ করতে পারি নি। সুধাকান্তবাবুর রহস্যও শেষ পর্যন্ত ভেদ করতে পারব কি না তা জানি না।'

'আমার তো মনে হয় রহস্য ভেদ করেছেন।'

'কাগজপত্রে করেছি। কাগজপত্রে রহস্য ভেদ করা এক জিনিস, বাস্তব অন্য জিনিস। যখন সুধাকান্তবাবুর মুখোমুখি বসব তখন হয়তো দেখব গুছিয়ে-আনা জিনিস সব এলোমেলো হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার কী, জানেন ভাই? প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না, সে নিজে কিন্তু খুব রহস্যময়।'

'কবে যাবেন সুধাকান্তবাবুর কাছে?'

'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই যাব। আপনি কি যাবেন আমার সঙ্গে?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই।'

৯

রাত প্রায় ন'টা।

আমি এবং মিসির আলি সুধাকান্তবাবুর বাড়ির উঠোনে বসে আছি। সুধাকান্তবাবু চুলায় চায়ের পানি চড়িয়েছেন। তিনি আমাদের যথেষ্ট যত্ন করছেন। মিসির আলিকে খুব আগ্রহ নিয়ে বাড়ি ঘুরে-ঘুরে দেখালেন। নানা গল্প করলেন।

বাড়ি আগের মতোই আছে। তবে কামিনী গাছ দু'টির একটি নেই। মরে গেছে। কুয়ার কাছে সারি বেঁধে কিছু পেয়ারা গাছ লাগান হয়েছে, যা আগে দেখি নি।

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'চা খেয়ে আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি খিচুড়ি চড়িয়ে দিচ্ছি।'

মিসির আলি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'খিচুড়ি মন্দ হবে না। তা ছাড়া শুনেছি আপনার রান্নার হতে অপূর্ব।'

আমাদের চা দিয়ে সুধাকান্তবাবু খিচুড়ি চড়িয়ে দিলেন। মিসির আলি বললেন, 'রান্না করতে-করতে আপনি আপনার ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলুন। এটা শোনার জন্যেই এসেছি। আগেও এক বার এসেছিলাম, আপনাকে পাই নি।'

'জানি। খবর দিয়ে এলে থাকতাম। আমি বেশির ভাগ সময়ই থাকি।'

'শুরু করুন।'

সুধাকান্তবাবু গল্প শুরু করলেন। ভৌতিক গল্পের জন্যে চমৎকার একটা পরিবেশ। অন্ধকার উঠোন। আকাশে নক্ষত্রের আলো। উঠোনের ওপর দিয়ে একটু পরপর হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। একটা তক্ষক ডাকছে। তক্ষকের ডাক বন্ধ হবার সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য ঝিঁঝিপোকা ডেকে উঠছে। ঝিঁঝিপোকা থামতেই তক্ষক ডেকে ওঠে। তক্ষকরা চুপ করতেই ডাকে ঝিঁঝিপোকা। অদ্ভুত কনসার্ট!

সুধাকান্ত গল্প বলে চলেছেন। মিসির আলি মাঝে-মাঝে তাঁকে থামাচ্ছেন। গভীর আগ্রহে বলছেন, 'এই জায়গাটা দয়া করে আরেক বার বলুন। অসাধারণ অংশ। গা শিউরে উঠছে।'

সুধাকান্তবাবু তাতে বিরক্ত হচ্ছেন না। সম্ভবত মিসির আলির গভীর আগ্রহ তাঁর ভালো লাগছে।

যেখানে মেয়েটি সুধাকান্তবাবরু পা কামড়ে ধরে, সেই অংশ মিসির আলি তিন বার শুনলেন। শেষ বার গভীর আগ্রহে বললেন, 'আপনি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মেয়েটি পিছন থেকে আচমকা আপনাকে কামড়ে ধরল?'

'জ্বি।'

'হাত দিয়ে ধরল না, আঁচড় দিল না—শুধু কামড়ে ধরল?'

'জ্বি।'

'দেখি কামড়ের দাগটা।'

তিনি কামড়ের দাগ দেখালেন। মিসির আলি পায়ের দাগ পরীক্ষা করলেন। জড়ান গলায় বললেন, 'কী অদ্ভুত গল্প! তারপর কী হল?'

সুধাকান্তবাবু গল্পে ফিরে গেলেন।

এক সময় গল্প শেষ হল। সুধাকান্তবাবু বললেন, 'খিচুড়ি নেমে গেছে। আপনাদের কি এখন দিয়ে দেব? রাত মন্দ হয় নি কিন্তু।'

মিসির আলি বললেন, 'জ্বি, খেয়ে নেব। আপনাকে দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি।'

'জিজ্ঞেস করুন।'

'মেয়েটি শুধু কামড়ে ধরল—হাত দিয়ে আপনাকে ধরল না কেন?'

'আমি কী করে বলব বলুন। আমার পক্ষে তো জানা সম্ভব না।'

'আমার কিন্তু মনে হয় আপনি জানেন।'

সুধাকান্তবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার গল্পের সবচেয়ে দুর্বল অংশ মেয়েটির কামড়ে-ধরা। মেয়েটি কিন্তু পেছন থেকে আপনাকে কামড়ে ধরে নি। পায়ের দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কামড়ে ধরেছে সামনে থেকে। আপনার দাগ ভালোভাবে পরীক্ষা করলেই তা বোঝা যায়। আপনাকে আক্রমণ করবার জন্যে মেয়েটি তার হাত ব্যবহার করে নি।

কারণ একটাই—সম্ভবত তার হাত পেছন থেকে বাঁধা ছিল। তাই নয় কি?'

সুধাকান্তবাবুর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। একটি কথাও বললেন না।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার গল্পে একটা কুকুর আছে। পাগলা কুকুর। হাইড্রোফোবিয়ার কুকুর কিছুই খায় না। অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে। অথচ এই কুকুরটা আস্ত একটি মেয়েকে খেয়ে ফেলল, পাঁচটা সুস্থ কুকুরের পক্ষেও যা সম্ভব নয়। আপনি অসাধারণ একটা ভূতের গল্প তৈরি করেছেন। কিন্তু গল্পে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে, তাই না?'

সুধাকান্ত বিড়বিড় করে কী-যেন বললেন। আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম। কী শুনছি এ-সব! মিসির আলি লোকটি এ-সব কী বলছে!

মিসির আলি বললেন, 'ব্যাপারটা কী হয়েছিল আমি বলি। আপনি চিরকুমার একজন মানুষ। আপনার মনে আছে অবদমিত কামনা-বাসনা। মহাপুরুষরাও কামনা-বাসনার উর্ধ্বে নন। কীভাবে যেন আপনি অল্পবয়সী একজন কিশোরীকে আপনার ঘরে নিয়ে এলেন। এই মেয়েটি কীভাবে এল বুঝতে পারছি না। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে পারে, বা অন্য কিছুও হতে পারে। এই অংশটা আমার কাছে পরিষ্কার না। ····

'যাই হোক, মেয়েটিকে আপনার ঘরে নিয়েই আপনি তার হাত বেঁধে ফেললেন। মেয়েটির চিৎকার, কান্নাকাটি আশেপাশের কেউ শুনল না। কারণ আশেপাশে শোনার মতো কেউ নেই। মেয়েটি নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে আপনাকে কামড়ে ধরল। এই একটি অস্ত্রই তার কাছে ছিল। ····

'অবশ্যি মেয়েটি নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত মারা গেল।—

'আপনি তার মৃতদেহ ঘরেই ফেলে রাখলেন। দরজা-জানালা খুলে রাখলেন, যাতে শেয়াল-কুকুর শবদেহটা খেয়ে ফেলতে পারে। এক দিনে তো একটা মানুষ শেয়াল-কুকুরে খেয়ে ফেলতে পারে না। হয়তো দু' দিন বা তিন দিন লাগল। এই সময়টা আপনি নষ্ট করলেন না, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেন। ভেবে-ভেবে অসাধারণ একটা গল্প তৈরি করলেন। সেই গল্পে সূত্র আছে, কুকুর আছে, অশরীরী আত্মীয়রা আছে। কি সুধাকান্তবাবু, আমি ঠিক বলি নি? দিন, এখন খাবার দিয়ে দিন—প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। খেয়ে নেব।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম সত্যি-সত্যি মিসির আলি খেতে বসেছেন। সুধাকান্তবাবু তাঁকে থালা এগিয়ে দিচ্ছেন। মিসির আলি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি খাবেন না?'

আমি বললাম, 'না, আমার খিদে নেই।'

মিসির আলি খেতে-খেতে বললেন, 'সুধাকান্তবাবু, আপনার বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করাবার মতো কিছু আমার হাতে নেই। যে-সব কথা আপনাকে বলেছি, সে-সব আমি কোর্টে টেকাতে পারব না, আমি সেই চেষ্টাও করব না। কাজেই আপনার ভয়ের কিছু নেই। তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আপনি থানায় গিয়ে অপরাধ স্বীকার করবেন। আচ্ছা, মেয়েটার নাম কি ছিল?'

সুধাকান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'বিন্তি। ওর নাম বিন্তি।'

'ও আচ্ছা, বিন্তি।'

মিসির আলি খুব আগ্রহ করে খাচ্ছেন। আমি দূরে থেকে তাঁকে দেখছি। সুধাকান্তবাবুও দেখছেন। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। সেই পলকহীন চোখে গভীর বিস্ময়।

মিসির আলি বললেন, 'খিচুড়ি তো ভাই অপূর্ব হয়েছে! আমাকে রেসিপিটা দেবেন তো! আমিও আপনার মতো একা-একা থাকি। মাঝে-মাঝে খিচুড়ি রান্না করব।' বলেই মিসির আলি বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি এর আগে এত অদ্ভুতভাবে কাউকে হাসতে শুনি নি, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

পরিশিষ্ট

আমার অধিকাংশ গল্পের শেষ থাকে না বলে পাঠক-পাঠিকারা আপত্তি তোলেন। এই গল্পের আছে। সুধাকান্তবাবু তাঁর অপরাধ স্বীকার করে থানায় ধরা দিয়েছিলেন। বিচার শুরু হবার আগেই থানা-হাজতে তাঁর মৃত্যু হয়।